নব্য আল্-বেরুনী

রেজাউল করীম

জহর সেন

সান্যাল প্রকাশন ।। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ২০০২।

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

এযুগের এবং ভাবীকালের
আল-বেরুণীদের প্রতি
শ্রদ্ধার্ঘ্য

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থের মুখ্য বিষয় রেজাউল করীমের মৌলপ্রত্যয়। আল্-বেবুণীব ইতিহাসচর্চা, ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞানভাবনা, জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্পর্কে সুকর্ণর বিচার বিশ্লেষণ, বিশ্বসমস্যা হিসাবে জাতিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়, মুক্তবুদ্ধির চর্চা প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিকদের উপলব্ধি এবং কান্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল ও লেকি প্রমুখ চিন্তাবিদদের ভাষ্য, তুর্কিবীর কামাল পাশার কৃতিত্ব বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতার নানাবিধ পরম্পরার প্রকৃতি-নির্ণয়, গান্ধীপথের অব্যর্থ রচনাত্মক ভূমিকা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে রেজাউল করীমের মৌলপ্রত্যয়ের আলোকে। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে দুটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য দলিল: বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'চারণের মর্মবাণী' এবং রেজাউল করীম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'আমরা যাহা বিশ্বাস করি'। চারণ আন্দোলনে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমস্বরে, গান্ধীপথ হযেছে ধ্রুব লক্ষ্যগামী। অতি-যান্ত্রিকতার কু-প্রভাবে মানবসমাজ এখন যেন মরুভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে দিশাহারা। এই গ্রন্থে আছে দিশা ও দিশারীর সন্ধান।

নিবেদন

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের পর রেজাউল করীম বহরমপুরেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। সে সময় কবি অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও বহরমপুর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা **পদাতিক** তাঁকে স্বাগত জানায় অজাতশত্রু অভিধায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে রেজাউল করীম তখন মধ্যমণি। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মণীশ ঘটকের সারস্বত সাধনার পুণ্যতীর্থ ছিল বহরমপুর।

স্বাধীনতার পর প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অন্নদাশংকর রায়। পরবর্তী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অশোক মিত্র। তাঁদের অদম্য উৎসাহে, উদ্যমে, প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক জীবন ছিল প্রভাদীপ্ত। এই জ্যোতির্ময় পরিমন্ডল থেকে তরুণদল প্রাণরস আহরণ করেছে। সভাসমিতি ও আলোচনা বৈঠকে রেজাউল করীমের স্নিগ্ধ হাস্যমধুর উপস্থিতি এবং স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যুক্তিশাণিত এবং প্রেরণাপ্রদ প্রবন্ধাবলি উদ্ভাসিত করেছে আমাদের মতো তরুণ বিদ্যার্থীদের মানসলোক।

এযুগে আল্-বেরুণী ও দারাশিকোহর সার্থক উত্তরসাধক হলেন রেজাউল করীম। তিনি নব্য আল্-বেরুণী, নব্য দারাশিকোহ। 'নব্য আল্-বেরুণী' শিরোনামটি এই গ্রন্থের জন্য আমি বেছে নিয়েছি। সর্বগ্রাহী ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে দারাশিকোহ চিরঞ্জীব। জ্ঞানচর্চার মুক্ত প্রাংগণে আল্-বেরুণী অবাধ বিচরণ করেছেন। তিনি প্রাচীর গড়েননি, সেতু গড়েছেন। নব্য আল-বেরুণী রেজাউল করীমের আজীবন ব্রত ছিল সেতুবন্ধন। জ্ঞানচর্চা ও জীবনচর্যার মাধ্যমে তিনি সংগ্রহ করেছেন সেতুবন্ধনের উপকরণ। আল্-বেরুণী ছিলেন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত। রেজাউল করীম ছিলেন সংস্কৃতি সমন্বয়-সাধনার প্রায়োগিক আদর্শের প্রতীক।

রেজাউল করীমের প্রতি আমার প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য ১৪০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত *রেজাউল করীম* (১৯০২-১৯৯৩)। এটি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১৪১ নং গ্রন্থ। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রভা প্রকাশনী প্রকাশ করে আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ *পূর্ণ মানব রেজাউল করীম।* বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্ম-প্রবর্তক সম্পর্কে রেজাউল করীমের ধ্যানধারণা আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে। জাতীয়তাবাদের ভিন্ন স্বর হিসাবে চারণ-আন্দোলনের গুরুত্বও বিশ্লেষণ করেছি।

নব্য আলবেরুণী রেজাউল করীম আমার তৃতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়বস্তু চয়ন ও পরিবেশন করা হয়েছে কিছু আধুনিক সমস্যার উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে। জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি সন্ধানে পথপ্রদর্শক হলেন আল্-বেরুণী ও ইবনে খালদুন। কীভাবে জাতীয়তাবাদ ইসলাম ও মার্ক্সবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব, তার তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার জননায়ক সুকর্ণ। সমগ্র বিশ্বজুড়ে ধর্ম, ভাষা, জাতিত্ব (race অর্থে), জাতি (nation অর্থে), সাংস্কৃতিক অস্মিতা, এসব কিছু একাকার হয়ে মিশে গেছে জাতিত্তার (ethnicity অর্থে) প্রবল স্রোতে। জাতিসত্তার জটিল প্রকৃতি তাই বিশেষভাবে অনুধ্যেয়। যুক্তিবাদ বলতে লেকি কী বোঝাতে চেয়েছেন? জন স্টুয়ার্ট

মিল-এর স্বাধীন চিন্তার ভাষ্য এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক? গ্রিক দর্শনে অনুরণিত হয়েছে মুক্ত বুদ্ধির জয়গান। কান্ট ছিলেন মুক্ত বুদ্ধির অনন্য দিশারী। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পশ্চিমি চিন্তানায়কদের ধ্যান-ধারণা তাৎপর্যমন্ডিত হয়েছে রেজাউল করীমের ভাষ্যে।

ভারতের স্বাধীনতা ও অখন্ডতা রক্ষার সংগ্রামে রেজাউল করীম ছিলেন আজীবন অহিংস সৈনিক। ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। পশ্চিমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোন থেকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন জাতীয়তাবাদের মর্মার্থ। নব্য ইসলাম ও আধুনিক তুলস্ক কবি নজরুল, আবদুল ওদুদ ও রেজাউল করীম প্রমুখ চিন্তাবিদকে এবং অগ্রচারী মুসলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে **সওগাত** পত্রিকা লিখেছিল:

> তুরস্কের এই নব প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হইলে কেবলমাত্র মুসলিম জগতের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাই যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে শান্তি ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে (**সওগত**, বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৩)।

ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সৃজনশীল পরম্পরা ছিল রেজাউল করীমের দৃঢ় আশ্রয়। পরম্পরার নানা ধারার সারকথা আলোচনা করেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, বর্তমান বিশ্বেও গান্ধীপথ সতত সৃজ্যমান। ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা যেমন চিরন্তন, গান্ধীপথের আলোকবর্তিতা তেমনি চিরভাস্বর। রেজাউল করীম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত চারণ আন্দোলনে গান্ধীপথ হয়েছে ধ্রুব লক্ষ্যগামী।

১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট **দেশ** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রেজাউল করীমের সঙ্গে আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার বিবরণ। আবুল বাশার লিখেছেন:

সমন্বয় চিন্তার চিরপথিক তিনি। গান্ধীদর্শনে তাঁর দীক্ষা, করীমের মানস-বীক্ষন-ভূমি অতন্দ্র ইতিহাস আর সাহিত্যের আলোয় মন্দ্রিত—জীবনের নিত্যচর্যায় তিনি সন্তের মত সহজ আর অনাড়ম্বর।

তাঁর 'ভাবনার উৎস' সম্পর্কে আবুল বাশার জানতে চেয়েছিলেন। রেজাউল করীম তাঁকে বলেছিলেন:

> পাঁচ রকমের বই পড়েছি আমি। মওলানা আজাদের লেখা বই পড়ে প্রেরণা পেয়েছি। সুরেনবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি) বন্ধু মজিবুর রহমানের একটি কাগজ ছিল—দি মুসলমান। নামটা যদিও মুসলমান—ত্রি-সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, কিন্তু একতার কথা প্রচার করত। সেই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও ছিলেন। এই সব গ্রেটম্যান-রা এঁর সঙ্গে ছিলেন এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে বড় বড় মুসলিম নেতারাও মিলন ও ঐক্যের কথা বলেছেন।

তাছাড়া পশ্চিমি সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে টমাস পেইন ও লেকি বেজাউল করীমকে খুবই প্রভাবিত করেছিল, একথা তিনি জানিয়েছিলেন আবুল বাশারকে। দৃঢ় স্বরে তিনি বাশারকে বলেছেন, উদার এবং মুক্ত চিন্তা 'এখান থেকে পেয়েছি। নিশ্চয়।'

দীর্ঘকাল (১৯৪৮-১৯৯৩) অন্তরঙ্গ যোগাযোগের জন্য তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির অনেক কথা আমার স্মৃতির মনিমঞ্জুষায় সঞ্চিত আছে। আমি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্র ছিলাম। পরে সেখানে অধ্যাপনাও করেছি। কৃষ্ণনাথ কলেজের গ্রন্থাগারে গ্রিক সভ্যতা ও ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। নির্বাচিত অমূল্য গ্রন্থগুলি তিনি আমার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন, পড়েছেন, আমাকে পড়িয়েছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রবয়সে কৃষ্ণনাথ কলেজে গ্রিক ইতিহাস পড়াতেন অধ্যাপক হরিপদ পান্ডে। গ্রিক সভ্যতায় মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরম্পরা অধ্যাপক পান্ডে ক্লাসে বারবার উল্লেখ করতেন। অধ্যাপক পান্ডের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন মুক্ত জ্ঞানচর্চার প্রেরণা। পরিণত বয়সেও এই প্রেরণা বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি (দেখুন, পরিশিষ্ট-৮ *'পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা'*)। ১৯৯১ সালের ১৯ জুলাই তার কিছু স্মৃতিচারণ আমি টেপ করেছি। সেদিনও তিনি অধ্যাপক পান্ডের প্রেরণা স্মরণ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর মানস-বীক্ষণ-ভূমি প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার চর্চায় আলোকিত হয়েছে।

সম্প্রতি ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও শ্রেণির স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় কামনা গবেষণার চমকপ্রদ বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। উত্তর—১৯৪৭ পর্বের জটিল সংকটের গতিপ্রকৃতির অনুসন্ধানই এই জাতীয় গবেষণার প্রেরণার মূল উৎস। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই ছিল রেজাউল করীমের ও তাঁর প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের সারস্বত সাধনার প্রধান প্রেরণা। ওই ধরনের ইতিহাসচর্চায় রেজাউল করীম বিশ্বাসী নন। ১৯৫৪ সালের ১৫ আগস্ট **হিন্দুস্তান স্টানডার্ড** পত্রিকায় তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জীবন্ত বিগ্রহরূপে আবদুল রসুলের মূল্যায়ন করেছিলেন। রেজাউল করীমের এই প্রবন্ধ থেকে আমরা জেনেছি, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে আবদুল রসুল বলেছিলেন:

> We are determined to remain one indivisible nation and nothing on earth can separate us.
> (এক অবিভাজ্য জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পৃথিবীর কোন কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।)

এই প্রত্যয়ই হল রেজাউল করীমের সাধনার বীজমন্ত্র। তাঁর সাধনা ভারতীয়ত্বের সাধনা।

এই গ্রন্থের ছয় ও সাত নম্বর পরিশিষ্টে উৎকলিত হয়েছে যথাক্রমে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'চারণের মর্মবাণী' এবং রেজাউল করীম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'আমরা যাহা বিশ্বাস করি'। এই দুটি দলিল এখন দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার থেকে আমি সংগ্রহ করেছি এই দুটি মহামূল্য ইস্তাহার। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ওই পাঠাগারের প্রাণপুরুষ হলেন দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর 'জীবনপথের দিশারী'। বিজয়লালের বিশিষ্ট সহযোগী রেজাউল করীমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীর ও অবিচল।

শ্রদ্ধেয় দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীকে জানাই আমার বিনীত প্রণাম। রেজাউল করীম লিখিত দু'টি প্রবন্ধ 'দার্শনিক কান্ট' এবং 'পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছিল বহরমপুর গার্লস কলেজ পত্রিকায়। ওই কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত গার্লস কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত রেজাউল করীম লিখিত ষোলোটি মূল্যবান প্রবন্ধ আমাকে দিয়েছিলেন (দেখুন ১৪০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত জহর সেন লিখিত *রেজাউল করীম*, পৃ: ৮৪)। এগুলির সুপ্রচার ছিল তাঁর একান্ত কামনা। তাঁকে আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। 'ইন্দোনেশিয়ায় গণ আন্দোলন' এবং ধর্মসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ আমি পেশ করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে। ইতিহাস সংসদের কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন অধ্যায়ের কোন কোন অংশ প্রকাশিত হয়েছিল নানা পত্রপত্রিকায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *সর্বোদয়, পরিচয়, ইতিহাস অনুসন্ধান-১১, যুগের ডাক, দর্পণে মুক্তমন, সময়প্রবাহ, ত্রিপুরা দর্পন, স্যন্দন পত্রিকা, দৈনিক যুগশঙ্খ, দৈনিক সংবাদ* ইত্যাদি। এইসব পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

রেজাউল করীম লিখিত 'সাম্প্রদায়িক ঐক্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ আবুল হাসনাত সম্পাদিত *জঙ্গম* পত্রিকায়। রেজাউল করীম ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি। আবুল হাসনাত রেজাউল করীমের ভাতুষ্পুত্র এবং আমার ছাত্র। তাঁকে জানাই অকুণ্ঠ সাধুবাদ। এদেশে অনেক মনীষীর সাধনালব্ধ মনিমুক্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে। পারিবারিক সাংস্কৃতিক সম্পদ আবুল হাসনাত নিপুন দক্ষতায় সংরক্ষণ করেছেন। নিয়ত চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি সেসব সম্পদ আমাদের গোচরে এনেছেন।

সুকন্যা ডঃ দেবশ্রী দাশ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, কলকাতা) রেজাউল করীমের আদর্শ অনুশীলনে ও প্রচারে সদাব্রতী। তাঁর উদ্যোগেই এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ আদর্শের মর্মবাণী প্রকাশ ও প্রচারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন আনন্দ প্রকাশন সংস্থার তরুণ কর্ণধার আনন্দ মন্ডল। তাঁদের জানাই সতত হিতকামনা।

— জহর সেন

**কৃষ্ণবীথি অ্যাপার্টমেন্ট
ফেইজ-৩, ফ্ল্যাট নং ২ডি,
৪৮৫, কালিকাপুর রোড,
গরফা পাটোয়ারি পাড়া,
পোঃ হালতু, কলকাতা - ৭৮**

বিষয় সূচি

পরিশিষ্ট - ১ : জীবন পঞ্জি

পরিশিষ্ট - ২ : রেজাউল করীমের গ্রন্থতালিকা

পরিশিষ্ট - ৩ : রেজাউল করীম সম্পর্কে লিখিত
পুস্তক ও প্রবন্ধের নিবাচিত তালিকা

পরিশিষ্ট - ৪ : শিখারাণী কুন্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার :—
'ডঃ রেজাউল করীমের চোখে বন্দেমাতরম,
মুসলিম পার্সোনাল ল, এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি'

পরিশিষ্ট - ৫ : বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত ইস্তাহার 'চারণের মর্মবাণী'

পরিশিষ্ট - ৬ : রেজাউল করীম ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত
ইস্তাহার 'আমরা যাহা বিশ্বাস করি'

পরিশিষ্ট - ৭ : রেজাউল করীম লিখিত 'দার্শনিক কান্ট'

পরিশিষ্ট - ৮ : রেজাউল করীম লিখিত 'পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা'

পরিশিষ্ট - ৯ : রেজাউল করীম লিখিত 'সাম্প্রদায়িক ঐক্য'

প্রথম অধ্যায়
আল্-বেরুণীর উত্তরাধিকার

সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত

আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহমদ আল্-বেরুণী। জন্মসাল ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার খোওয়ারিজাম রাজ্য। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্য অধিকার করেন সুলতান মাহ্‌মুদ। সুলতানের বিরুদ্ধে আল-বেরুনী মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। সুলতান তাঁকে বন্দি করে ভারতে পাঠান। বন্দিদশায় তিনি যত্রতত্র যেতে পারতেন না, মেলামেশাও করতে পারতেন না। কিন্তু হিন্দু পন্ডিত ও সাধুদের সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর। কয়েক বছর ধরে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখলেন। গভীরভাবে আয়ত্ত করলেন হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যা। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি মহামূল্য গ্রন্থ লিখলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে *কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ্*।

আল্-বেরুণী লিখিত গ্রন্থ, অনূদিত গ্রন্থ ও নানা লেখার টুকরোটাকরা ভগ্নাংশ, সব মিলিয়ে সংখ্যা হবে একশ বিরাশি। এর মধ্যে অন্তত ছাব্বিশটি ভারত বিষয়ক। এগুলির অধিকাংশই এখন পাওয়া যায় না। *কিতাব আল্-হিন্দ* গ্রন্থটি সংকলিত হয় ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭ সালে। ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

আল্-বেরুণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয় করেছেন রেজাউল করীম "সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত" রূপে। তাঁর *সাধক দারাশিকোহ* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। তিন বছর পর ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে এই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুত পঠন (Rapid Reading) রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা লেখেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (দেখুন, জহর সেন লিখিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত *রেজাউল করীম*, পৃ ১১০-১১৮)। এই গ্রন্থ রেজাউল করীম উৎসর্গ করেছেন "ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয় ও মিলনের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী সেই নবযুগ প্রবতর্ক মহামানব রাজা রামমোহন রায়, সাধক কেশবচন্দ্র সেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে.....।" এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে রেজাউল করীম লিখেছেন:

> দারা ছিলেন রাজপুত্র ও মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু ইহা তাহার আসল পরিচয় নহে। হিন্দু মুসলমান ও সংস্কৃতি-সমন্বয় ও মিলন ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। এক কথায়, তাহাকে সমন্বয়াচার্য বলা যাইতে পারে।

সাধক দারাশিকোহ গ্রন্থের শেষ অধ্যায় হল "সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত আল্-বেরুণী।" এই প্রবন্ধের শেষ কয়েকটি কথায় তিনি আশা প্রকাশ করেছেন:

> .....মহামনীষি আল্-বেরুণীর সাধনা সার্থক হইবে—মহাপ্রাণ সাধক দারাশিকোহের আত্মবলিদান সফল হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সদ্ভাব সম্ভব হইবে।

মহামনীষী আল্-বেরুণীর সার্থক উত্তরসূরি মহাপ্রাণ সাধক দারাশিকোহ। সাধক দারাশিকোহের সার্থক উত্তরসূরি পূর্ণ মানবতার সন্ধানী রেজাউল করীম। এই ভাবেই একদিন আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় অন্নদাশংকর রায় রেজাউল করীমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর (অন্নদাশংকরের) প্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে।

রেজাউল করীমের মতে, "সংস্কৃতি হইতে ধর্ম আলাদা বস্তু। ধর্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু; কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগৎকে লইয়া।" বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন, হয়ত খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমণ্বয়-সাধন কঠিন ত নয়ই। যুগে যুগে প্রত্যেক দেশে এটাই ঘটেছে। প্রাক-পিথাগোরাস যুগ থেকে মেগাস্থিনিসের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও গ্রিসের মধ্যে ছিল নিরন্তর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

প্রাক-ইসলামি যুগে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ছিল ভারতবর্ষ ও আরব জগতের মধ্যে। মাঝখানে তিনশ বছর এই প্রবাহ ছিল অবরুদ্ধ। পুনরায় আল্-বেরুণীর সাধনায় প্রাণবান হয়ে উঠে ভারত ও আরবের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রবাহ। রেজাউল করীম লিখেছেন, "আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাহার নিকট চিরঋণী।" *কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ* শীর্ষক বিশ্ববন্দিত গ্রন্থটি ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেন মনীষী আল্-বেরুণী। দশম-একাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমাজজীবন স্বচ্ছ ভাষায় চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের অধঃপতনের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, অধঃপতনের কারণ হিন্দুধর্ম নয়, হিন্দুদর্শনও নয়। তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যাচর্চা হ্রাস পেয়েছে। অতিমাত্রায় বেড়েছে পুরোহিত

শ্রেণির দাপট। স্বাধীন চিন্তার পথ অবরুদ্ধ। মুসলমান-মানসও তখন অধঃপতিত। এর কারণ তুর্কি প্রাধান্যের বিস্তার।

এক ধরনের দাস মনোভাবে হিন্দুরা আচ্ছন্ন ছিল। বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। জ্ঞানের আদানপ্রদানে তাদের আগ্রহ ছিল না। তারা ছিল আত্ম-গর্বী ও সংকীর্ণচেতা। ভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল। পারস্যেও ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের পরম স্তরে জাতিভেদ প্রথার গুরুত্ব ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে তীব্র আগ্রহের অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এজন্য কোন দুঃসাহসিক কাজে তারা ছিলেন অসমর্থ। বহু জ্ঞানী হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অনেক অজ্ঞ সাধারণ মানুষ ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সম্ভবঅসম্ভব অনেক অলৌকিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করত তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। আল্-বেরুণী লক্ষ্য করেছিলেন, সাধারণের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচারে হিন্দু দার্শনিক পন্ডিতদের এতটুকুও আগ্রহ ছিল না। সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার ও আচার বিচারের গ্লানি থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য হিন্দু দার্শনিকগণ পালন করেননি। হিন্দু দার্শনিকদের এই ঔদাসীন্য ও অবহেলাকে আল-বেরুণী মেনে নিতে পারেননি।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর কৃপা করেন। আল্-বেরুণীর বিচারে এটাই গীতার সারমর্ম। এই উদারপন্থী ভাষ্য এযুগে অনেক গোঁড়া হিন্দু মানবেন না। কিন্তু দশম-একাদশ শতাব্দীতে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের সংস্কারমুক্ত মানুষ আল্-বেরুণী যেভাবে হিন্দুধর্মকে দেখেছিলেন, ঠিক সেই মতোই হিন্দুধর্মকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বেদকে তিনি মেনেছেন ঈশ্বর-প্রেরিত সর্বাগ্রগণ্য গ্রন্থরূপেই। অষ্টাদশ খন্ডে বিভক্ত পুরাণকে তিনি গল্প-সংগ্রহ বলেছেন। কোন গল্পে আছে নীতিকথা। কোন কোন গল্প রূপকমাত্র। তিনি তাঁর জ্ঞানসাধনাকে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য গ্রন্থির উপকরণরূপে প্রয়োগ করেছেন। রেজাউল করীমের ভাষায় তিনি ছিলেন "সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত।"

অগ্রণী ভারত বিশেষজ্ঞ

১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক সভায় অধ্যাপক এম.এস. খাঁ বক্তৃতা করেন। তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল "Al-biruni – the real founder of Indology" (আল্-বেরুণী-ভারতবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা)। এই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির ওই মাসের বুলেটিন-এ।

অধ্যাপক খাঁ তার ভাষণে বলেন, প্রচলিত ধারণা হল উইলিয়ম জোনস ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বিশ্বে তিনিই হলেন ভারতবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আল্-বেরুণী উইলিয়ম জোনস-এর হাজার বছর আগে মূল

আকরের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেন। সেগুলি সন্নিবেশিত হয় তাঁর নানা গ্রন্থে। আল্‌-বেরুণীর পূর্বে বেশ কয়েকজন গ্রিক, চিনা এবং আরব পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের আকর হিসাবে অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আল্‌-বেরুণীর গ্রন্থাদিতে বিষয়বস্তুর যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা পাই, ওই সব পর্যটকদের বিবরণে তা একান্তই অনুপস্থিত। আল্‌-বেরুণীই ভারতবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। মূল আকর থেকে তথ্য সংগ্রহে তিনি অতুলনীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বিদেশি বিদ্যানুরাগীদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ভারত বিশেষজ্ঞরূপে বন্দিত।

বিদ্রোহী মানস

রামায়ণের কাহিনি সম্পদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে বলেছেন:

> এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক মনে করি। ইহার মধ্যে হয়ত তথ্য খুঁজিলে ঠকিব, কিন্তু খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত করিলে কেবল নিজত্বই হারানো হয়, সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই থাকার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এই কথা নিশ্চিত রূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

রবীন্দ্রসদনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬১তম বার্ষিক অধিবেশনে অমর্ত্য সেন রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচারবিশ্লেষণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বয়ং অমর্ত্য সেন। তাঁর ভাষণের শিরোণাম তিনি দিয়েছেন 'হিস্টরি অ্যান্ড এন্টারপ্রাইস অফ নলেজ' অর্থাৎ ইতিহাস এবং বিদ্যালাভের উদ্যোগ। ভারতবর্ষে অধুনা কাল্পনিক

পৌরাণিক গল্পকে ইতিহাসরূপে গণ্য করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে ইতিহাস বিদ্যার। এই প্রসঙ্গেই অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথকৃত রামায়ণের বিচারবিশ্লেষণ স্মর্তব্য মনে করেছেন।

অর্থনীতিবিদ হিসাবে ইতিহাস বিদ্যার চর্চায় তিনি কেন মনোযোগী হয়েছেন তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: But history is not just for historians. It affects the lives of the public at large. We non-historians do not have to establish our entitlement to talk about history.

ইতিহাস শুধুমাত্র ঐতিহাসিকদের জন্যই নয়। সাধারণ মানুষের জীবনকেও ইতিহাস প্রভাবিত করে। ইতিহাস সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার, যারা ইতিহাস চর্চা করেন না, তাদেরও আছে। অর্মত্য সেন তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন:

১. সাধারণ মানুষের আলাপ আলোচনায় ইতিহাসকে প্রায়ই টেনে আনা হয় কেন?
২. ইতিহাস থেকে সাধারণ মানুষ কী পায়?
৩. ইতিহাস কেনই বা মানুষের মতামতের রণক্ষেত্র?

বিদ্যার ব্যবহার

ইতিহাস সাধারণ মানুষ কেন আগ্রহ বোধ করে, এই প্রসঙ্গ দিয়েই অমর্ত্য আলোচনা শুরু করেছেন।

১. বিদ্যার্জনে ঔৎসুক্য

অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনা জানার জন্য সাধারণ মানুষের কৌতূহল অতি স্বাভাবিক। কৌতূহলের কারণ বিবিধ এবং কখনও কখনও খুবই জটিল! অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে মানুষ শিখতে চায়। কখনও নির্দিষ্ট কালপর্বে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সে জানতে চায়। কখনও প্রচলিত নানা ধরণের সাল, সন, অব্দের উৎস অনুসন্ধান করে সে পায় অশেষ আনন্দ। ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলি সব সময় সহজ সরল হবে, তা কিন্তু নয়। চিন্তামূলক, কল্পনাশ্রয়ী দার্শনিক ব্যাখ্যাও থাকতে পারে প্রচ্ছন্নভাবে সেসব প্রশ্নের মধ্যে।

২. বাস্তব কারণ

সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করা হয় অতীত ইতিহাসের সম্পর্ক। অতীত ঘটনার ইতিহাসের যথার্থ চর্চা বা বিকৃত চর্চা প্রভাবিত করে বর্তমানের রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রায়ই সৃষ্টি হয়েছে কিছু অভিযোগের উপর ভিত্তি করে। অভিযোগ সত্য হতে পারে আবার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টও হতে পারে। অভিযোগগুলি কিছু অতীত কর্মের

সঙ্গে যুক্ত। অতীত কর্ম বাস্তবে ঘটেছে। আবার এও হতে পারে সেগুলি কল্পিত। উদাহরণ হিসাবে অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন রওনডার হত্যাকান্ড। এর পিছনে কাজ করেছে জাতিসত্তাগত দ্বন্দ্বের ইতিহাস বা কল্পিত ইতিহাস।

আর একটা উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগিতা বোঝার জন্য আদৌ প্রয়োজন নেই মোগল সম্রাটদের আচার আচরণ বিচার। মোগল সম্রাটবা কি সংকীর্ণমনা ছিলেন? না, সমন্বয়বাদী ছিলেন? তাঁরা কি অত্যাচারী ছিলেন, না সহিষ্ণু ছিলেন? বর্তমান ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় বারংবার বলা হচ্ছে, মোগল শাসন ছিল হিন্দুবিরোধী। এই বক্তব্য ভ্রান্ত ও অভিসন্ধিমূলক। বর্তমান তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এর সদুত্তর দিতে না পারলে, তা হবে বাস্তব যুক্তির অবহেলার নামান্তর। এই ক্ষেত্রে বিদ্যার উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যার ব্যবহার। বিদ্যার অন্বেষণের ক্ষেত্রে কিন্তু একারণে সত্যের প্রাসঙ্গিকতা ক্ষুন্ন হয় না।

৩. আত্মপরিচিতি বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে আমাদের আত্মপরিচিতির বিশ্লেষণ সংক্রান্ত নানা গভীর প্রশ্ন। এক্ষেত্রেও ইতিহাস বিদ্যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অতীত সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ধারণা প্রবলভাবে প্রভাবিত করে আমাদের আত্মপরিচিতিবোধকে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্মের পূর্বে আমাদের কোন অতীত নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আমাদের আত্মানুভূতি সম্মিলিত ইতিহাস চেতনায় একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা ভাবি, আমরা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ('belong') এবং সেই গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেই আমরা আমাদের পরিচয় দিচ্ছি ('identify')। গোষ্ঠী পরিচিতির ইতিহাস থেকেই আমাদের আনুগত্যবোধ গড়ে ওঠে।

ইতিহাসকে এইভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে একটি দার্শনিক প্রশ্ন। অমর্ত্য প্রশ্নটি এইভাবে উত্থাপন করেছেন: আমাদের আত্মপরিচিতি কি প্রধানত আবিষ্কারের বিষয় (matters of "discovery") না, তা হল অনেকাংশে নির্বাচন ও বাছাই করার বিষয় ('matters of selection and choice')? গোষ্ঠীনির্ভর বা সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয়ের বিশেষ কেন্দ্রীয় ভূমিকার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু শ্রেণি, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক প্রত্যয় বা সাংস্কৃতিক প্রভাবও মানুষের আত্মপরিচিতির সঙ্গে যুক্ত। ফলে ঐতিহাসিক শিকড়ের ক্ষেত্র ('the domain of one's historical roots') সত্যই নাটকীয়ভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয়

ইতিহাসের অন্বেষণে তাই জ্ঞানগ্রাহ্য সত্যতা মেলে না। এর ফলে সুস্পষ্ট অতিসরলীকরণে দার্শনিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির ত্রিধারায় তিনি লালিত হয়েছেন। একথা বুঝতে হিন্দুত্ববাদীদের নিশ্চয়ই সমস্যা হবে। আপনার ধর্মমত যাই হোক না কেন, অশোক বা আকবর বা কবীর বা আর্যভট্ট বা ভাস্করের ঐতিহাসিক কৃতিত্বে আপনি গর্বিত। অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার যুক্তিপছন্দ বা অপছন্দকে যদি অগ্রাহ্য করি, তবে তা হবে নিঃসন্দেহে হানিকর। ভারতের অতীত সম্পর্কে আপনি গর্বিত। অর্মত্য বলছেন, তা হলে আপনাকে বিচারবিশ্লেষণ করতে হবে, ঠিক কী বিষয়ে আপনার গর্ব। কারণ, ভারতবর্ষে মুক্তমনা ধর্মদ্রোহিতার অজস্র নজির আছে। এটি মেনে না নিলে সংকীর্ণ গলিতে আপনি পথভ্রষ্ট হবেন। অর্মত্য সেন ব[illegible]ন,

While discovery and choice compete as the basis of identity, knowledge and choice are essentially complimentary to each other. Engagement with issues of identity enriches the enterprise of knowledge and extends its reach.

পরিচিতির ভিত্তি হিসাবে আবিষ্কার ও চয়ন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদ্যা ও চয়ন মূলত পরস্পরের পরিপূরক। পরিচিতির নানা বিষয় প্রসঙ্গে চর্চা বিদ্যার উদ্যোগকে করে সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত।

বিজ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তি

ইতিহাস শুধুমাত্র বিদ্যার একটি উদ্যোগ তা নয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যার অন্যান্য উদ্যোগও। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল মুক্তমন, মুক্তবুদ্ধি ও বিদ্রোহী মানস। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় নতুন ভাবধারা, নব নব আবিষ্কার। অর্মত্য এই প্রসঙ্গে গ্যালিলিও, নিউটন এবং ডারউইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির থেকে শুরু করে গুপ্তযুগে অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আমরা দেখতে পাই, তার উৎস অনুসন্ধান করতে হবে প্রাক্‌-গুপ্ত যুগে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী-মানস পরম্পরায়। অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন, নাস্তিকতা এবং ধর্মীয় সংশয়বাদের পক্ষে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় যে সাহিত্যসম্ভার আছে, তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষার সাহিত্যে তা বিরল।

অবলোকন, অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ভারতীয় দর্শনে লোকায়ত ও চার্বাক সাহিত্যে অবলোকন ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে, অবলোকন-প্রাপ্ত নয়, এমন সাক্ষ্যের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে।

গৌতম বুদ্ধ নাস্তিকতার পক্ষে স্পষ্টোক্তি করেছেন। প্রচলিত বিশ্বাস ও মতামত সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অমর্ত্য সেন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে জবালীর নির্দেশ উল্লেখ করেছেন। জবালী বলেছিলেন, 'পরলোক নেই, পরলোক প্রাপ্তির জন্য কোন ধর্মীয় অনুশীলনও নেই। অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত পথ অনুসরণ করো। মানুষের অভিজ্ঞতার পরপারে কী আছে, তা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্যভট্ট অবলোকন ও অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্কর। এইসব জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গ্রন্থ আরবি ভাষার অনুবাদ করা হয়েছিল। সে সব অনুবাদেও আলোচিত হয়েছিল অবলোকন ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব।

ইতিহাসের ইতিহাস ও নিরীক্ষ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাসের ইতিহাস থেকে আমরা শুধুমাত্র বিষয়বস্তুই পাই না, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেকালের পরম্পরাও ইতিহাসের ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস মিল (James Mill) লিখেছিলেন তিন খণ্ডে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চার পরম্পরা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনা, এ সব কিছুই তিনি অগ্রাহ্য করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্যুতিতে মুগ্ধ ছিলেন উইলিয়ম জোনস্ (William Jones)। এজন্য জোনসকে তিনি তিরস্কার করেছেন। ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র অগ্রগতি লাভ করেছিল, দশমিক প্রথা এবং শূন্যের আবিষ্কার যে ভারতের কৃতিত্ব, এসব তথ্য জেমস মিল অস্বীকার করেছেন।

তুলনামূলক বিচারে আল্-বেরুণীর *তহকিক অল হিন্দ* গ্রন্থটি যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠ। মধ্য এশিয়ায় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আল্-বেরুণী। ভারতবর্ষে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় গ্রন্থ তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। ভারতেই যে দশমিক প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছিল, আল্-বেরুণী তা স্পষ্ট লেখেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ব্রহ্মগুপ্তের যুগান্তকারী গ্রন্থ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন মহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম অল ফজরি। এই

অনুবাদকর্মে আল্-বেরুণী সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই এগারো শতকে স্বয়ং তিনি এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। নবম শতকে আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে ভারতীয় গ্রন্থাদি। আরবদের মাধ্যমেই ভারতীয় দশমিক প্রথা, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইউরোপে পৌঁছে যায়।

ইতিহাসের ইতিহাস থেকে বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি। যথা, ইরাণের সঙ্গে গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের এবং অন্যদিকে ব্রিটেনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষে যে বৈজ্ঞানিক চর্চা হত, তা চমৎকার উদ্ভাসিত হয়েছে ইতিহাসে। বিশেষ করে বুদ্ধির মুক্তি ও বিদ্রোহী মানসের রচনাত্মক ভূমিকা তাঁর ইতিহাসে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্ত আল-বেরুণীর কালপর্ব থেকে কয়েকশত বছর আগেই মারা গেছেন। কিন্তু আল-বেরুণীর ইতিহাসে তাঁদের মতবিরোধ এবং সেই মতবিরোধের তাৎপর্য স্পষ্ট ভাষায় স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধির মুক্তি, বিদ্রোহী মানস এবং নৈতিক সাহসের প্রয়োজন আল্-বেরুণীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুক্তমনা সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন

মুখবন্ধ

"কোন যুগেই মানব একা দাঁড়ায় না, সে পিতার পুত্র এবং পুত্রের পিতা। সুতরাং, যেমন নৃতত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন যে অবিমিশ্র রক্তের কোন জাতি নাই, তেমনি ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, সব সভ্যতাই একটি মিশ্র দ্রব্য, নানা স্থান নানা যুগ হইতে ধার করা অংশ দ্বারা গঠিত। এই জন্য আরবসভ্যতা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা একটি জাতি বিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে; ইহাতে জগতের সকলের স্বার্থ আছে। আমরা ইহার নিকট ঋণী এবং ইহা আরবে নহে এমন জাতি— যেমন গ্রিক, হিন্দু, আর্য-ইরানির পূর্বপুরুষদের নিকট ঋণী। এই আরবেরা না থাকিলে সেই প্রাচীন সভ্যতা লোপ পাইত, বর্তমান জগতকে আবার সব জিনিস নূতন করিয়া গড়িতে হইত, ইহাই আরব জাতির জগতে প্রতিষ্ঠার কারণ।"

এই মহামূল্য মতামত এখানে উৎকলিত হয়েছে সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত "ওমর খৈয়াম" গ্রন্থে (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৯) ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা থেকে। ইবনে খালদূনের সারস্বত সাধনা এই বক্তব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরবে ইতিহাস চর্চা

ইতিহাস বুভুক্ষা ছিল আরব সভ্যতার প্রাণশক্তির অন্যতম প্রধান পরিচয়। হজ্‌রত মুহম্মদ (খ্রি ৫৭০ - ৬৩৩) ও তাঁর অনুচরগণকে কেন্দ্র করে যে অজস্র কাহিনি গড়ে উঠেছিল, ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ সেগুলি সযত্নে লোকশ্রুতিরূপে সংগ্রহ করেছিলেন। হজ্‌রত মুহম্মদের সঙ্গে আপন যোগসূত্র আবিষ্কারে প্রত্যেক মুসলমান পরিবার উৎসুক ছিলেন। তাছাড়া, অতীত গৌরবকথা লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আরবদের হাতে পরাজিত মানুষেরাও। আব্বাসীয় যুগে (খ্রি ৭৫০ সালের পরে) জীবনচরিত, বিজয়কাহিনি ও বংশতালিকা প্রণয়নে ইতিহাসচর্চা নিবন্ধ ছিল। ইবনে ইসাক (মৃত খ্রি ৭৬৭) লিখিত মুহম্মদের জীবনী, আল-ওয়াকিদি (খ্রি ৭৪৭ -

৮২৩) রচিত মুসলমান বিজয়কাহিনি, আল বালাধুরি প্রণীত *ফুতুয়া-আল বুলদান* প্রথম যুগে ইতিহাসচর্চার উদাহরণরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি। কালানুক্রমিক ঘটনা বিন্যাস পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনায় অগ্রচারী ছিলেন আল তাবারি (খ্রি ৮৩৮ - ৯২৩)। পূর্বসূরি ঐতিহাসিক সৃষ্টি ও পারস্য সাহিত্য থেকে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেন। আল মসুদী বিষয়ানুগ পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনায় আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন সাধক ও জ্ঞানীর। এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ও জাঞ্জিবার তিনি ভ্রমণ করেন। সংগৃহীত উপাদানে তিনি প্রণয়ন করেন ত্রিশ খন্ড পুস্তক।

ইবনে খালদুনের পরিচয়

আবু জায়েদ আবদুল রহমান ইবনে খালদুন (খ্রি ১৩৩২ - ১৪০৬) আরবীয় ইতিহাস দর্শনের প্রথম স্রষ্টা। মধ্যযুগের কালসন্ধিতে তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত। টিউনিসে তাঁর জন্ম। দক্ষিণ আরবে কৃষি অঞ্চল হজরমাউতে তাঁদের নিবাস ছিল। কুড়ি বছর বয়সে মরক্কোস্থিত ফেজের সুলতানের সহকারীরূপে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। রাজরোষে আবদুল রহমানকে দুই বছরের (১৩৫৭ - ৫৮) কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেনে চলে আসেন। গ্রানাডার সুলতান ষষ্ঠ মুহম্মদ রাজদূতরূপে ক্যাস্টিলের রাজা পেড্রোর দরবারে তাঁকে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ঈর্ষার পাত্র হয়েছেন এমন আশঙ্কা করে তিনি স্পেন ত্যাগ করেন এবং আফ্রিকায় ফিরে আসেন। আলজিরিয়ায় বৌগির সুলতান তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এখান থেকে তিনি বারবার উপজাতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন কয়েকটা অভিযান। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাময়িকভাবে অবসর নেন। তারপর চার বছরের একনিষ্ঠ সাধনায় রচনা করেন বিশ্ববন্দিত ইতিহাস *মুক্কদিময়ে তারীখ*। মক্কায় তীর্থ ভ্রমণের বাসনা নিয়ে ১৩৮২ সালে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেন। ইতিমধ্যে কায়রোতে অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার এবং পরে প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হন। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে তাঁর দেহাবসান হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর জীবন ছিল অতি ঘটনাবহুল। পণ্ডিতের সাহচর্যে, অশিক্ষিতের সান্নিধ্যে, অতীতের রত্নশালায়, বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহে, অভাবের যন্ত্রণায় এবং প্রাচুর্যের আনন্দে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার দুর্লভ মনিমুক্তো সংগ্রহ করেছেন।

খালদুনের ইতিহাস সাধনা

মুক্কদিময়ে তারীখ (বা ইতিহাসের ভূমিকা) একটি অতি বিস্ময়কর যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই বিশাল গ্রন্থ প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত : (ক) *মুক্কদিমহ* (বা ভূমিকা),

(খ) মূলগ্রন্থ *কিতাবুল ইবর* এবং (গ) *তারীখ* (বা জীবন চরিত)। হরেন্দ্রচন্দ্র পাল "ইবন-খলদূন ও তাঁহার ইতিহাস দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে (*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> সাধারণভাবে খালদুনের মূল গ্রন্থটি ইতিহাস (বা তারীখ) বলিয়া অভিহিত হইলেও, ইহার প্রকৃত নাম "কিতাবুল ইবর।" ইবরের মূল অর্থটি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিব। ইবর 'ইবরহ' শব্দের বহুবচন। এই ক্রিয়াবিশেষ্য 'ইবরহ' মূল ক্রিয়াধাতু ই-ব্-র্ হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ অতিক্রম করা, অনুধাবন করা, অন্তঃপ্রবেশ করা। সাহিত্যে ইহার অর্থ রূপক ব্যাখ্যা (ইবারহ্) বা যাহার সাহায্যে বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে ঘটনা বা বিষয় (খবর) অর্থে ব্যবহৃত হইলেও 'ইবরহ'র মূল অর্থ (ঘটনা হইতে প্রাপ্ত) শিক্ষা বা ইঙ্গিত (যেমন কোরানের আয়াত)। বস্তুত ইতিহাসের মূল লক্ষ্যও ঘটনার বিবৃতি নহে— ইহার আলেখ্য মূল-তত্ত্বের অনুধাবন।

ইতিহাসের সারকথা

খালদুনের মতে, মানব সমাজ বা সভ্যতার বিবরণই ইতিহাস। তিনি মনে করেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিই হল ইতিহাসের আলোচ্য সারকথা : প্রথমত, মানব সমাজের রূপান্তর—বন্যজীবন, সামাজিক জীবন, গোষ্ঠীবদ্ধতা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, একদল মানুষের বিরুদ্ধে অন্য একদল মানুষের বিপ্লব, বিদ্রোহ ও বিরোধিতা। তৃতীয়ত, মানুষের নানা কার্য ও পেশার কথা। এসবকিছু জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহের জন্য হতে পারে বা বিবিধ বিজ্ঞান ও শিল্প কর্মের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। চতুর্থত, সাধারণভাবে সমাজ আপন প্রকৃতিবশে যে ভাবে রূপান্তরিত হয়, তার কথা। সতত পরিবর্তনের বিবরণই ইতিহাসের সারমর্ম। চলিষ্ণু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রাষ্ট্রকাঠামো, ধর্মীয় মতবাদ সব কিছুরই রূপান্তর ঘটে। পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হয় না, বা হলেও অতি অল্পসংখ্যক লোক তা অনুধাবন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে খালদুন একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের তুলনামূলক বিচারের প্রবণতা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই বিচার পদ্ধতিতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি।

এখানেই প্রয়োজন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ। যাবতীয়

ঘটনার উৎসের সন্ধান অপরিহার্য। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মন ও প্রজ্ঞার সহযোগে যা সম্ভবপর এবং যা সম্ভাব্য নয়, এই দু'য়ের মধ্যে তফাত করতে হবে। সম্ভাব্যতা নিছক যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত বা মনোজগতে সৃষ্ট সম্ভাব্যতা নয়। বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কিনা, ভাল করে তা বোঝা দরকার। খালদূনের মতে, বিশেষ বিশেষ সমাজের নির্দিষ্ট লক্ষণ সর্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই প্রাপ্ত বিবরণের সত্যতা বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি পাওয়া যাবে। তিন শ্রেণির ঘটনাকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন : প্রথম, যে সমুদয় ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ও স্বতোৎসারিত। দ্বিতীয়, আকস্মিক ও গুরুত্বহীন ঘটনা। তৃতীয়, যে সব ঘটনা আদৌ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ মানদণ্ডের অভাবে বিপুল অনুসন্ধানের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়, মূল্য নির্ণয়ে বিচার বিভ্রান্তি ঘটে। তাই ঘটনাবলিকে যদি এই তিনটি শ্রেণিতে কক্ষভুক্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে কাঙিক্ষত মানদণ্ড অনুসন্ধানকারীর, দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে।

নানা আলোচনায় তিনি সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি বিবৃত করেছেন: প্রথম, যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কিছু নিয়ম আছে, ঠিক তেমনি (ঠিক ততটা সুনির্দিষ্ট নয়) সমাজের নানা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমন কিছু নিয়মকানুন আছে। এই নিয়মকানুন জানতে পারলে আশেপাশের ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করা সহজ হয়।

দ্বিতীয়, বৃহৎ জনসমষ্টির উপরই এই সব নিয়মের প্রয়োগ স্পষ্ট বোঝা যায়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এগুলি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। খালদুন নিজেই লক্ষ্য করেছেন যে, পচনশীল রাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টায় বহু শক্তিশালী সংস্কারক ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রবল সমাজশক্তির কাছে বহু ক্ষেত্রেই নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের অভিরুচি ও বিশ্বাস।

তৃতীয়, অজস্র ঘটনার সন্নিবেশ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এই সমুদয় নিয়মকানুন আবিষ্কার করা যায়। অতীত বিচরণ ও বর্তমান অনুধাবন, এই দুই সূত্র থেকে ঈপ্সিত ঘটনা সংগ্রহ সম্ভব।

চতুর্থ, সমাজ স্থবির নয়, জঙ্গম। এর রূপান্তর আছে, বিবর্তন আছে। বিবর্তনের কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন সমাজের মানুষের মধ্যে সংযোগের ফলে অনুকরণপ্রবণতা সঞ্চারিত হয়, ফলে সাঙ্গীকরণ, সংমিশ্রণ ঘটে।

পঞ্চম, এই সমস্ত নিয়মকানুন নিছক জৈবিক এষণা বা প্রাকৃতিক কারণের প্রতিবিম্ব

নয়। এগুলি যথার্থই সমাজতাত্ত্বিক। জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাবকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন গোষ্ঠীবদ্ধতা, পেশা, অর্থনৈতিক সম্পদ ইত্যাদির সামাজিক প্রভাবের উপর।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিই হল সমাজতাত্ত্বিক। তিনি মনে করেন যে, এক শ্রেণি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পার্থক্য সবক্ষেত্রে তাদের জাতিগত উৎপত্তির বিভিন্নতার জন্য নয়। একই অঞ্চলের অধিবাসী বলেই বা একই গোষ্ঠীর এবং একই পেশার অন্তর্গত হলেই যে তাদের উৎপত্তি একই জাতিগত হবে, এ ধরণের সিদ্ধান্ত সব সময় সঙ্গত নয়। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের পার্থক্যের অন্য কারণও থাকতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিকতা, জীবনযাত্রায় কিছু অভ্যাসের সমষ্টি বা একান্ত নিজস্ব বিশেষ বিশেষ কিছু লক্ষণের জন্যও পার্থক্য ঘটতে পারে।

তিনি লক্ষ্য করেছেন, পরাজিত মানুষ বিজয়ী মানুষের নানা আচরণ অনুকরণ করে। অনুকরণ স্পৃহা কখনও মন্থর গতিতে অচেতনভাবে সঞ্চারিত হয়, কখনও অঙ্কুরিত হয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বীজরূপে। খালদুনের আমলে স্পেনের মুসলমানরা যেভাবে প্রতিবেশী গ্যালিসীয় খ্রিস্টানদের অনুকরণের চেষ্টা করেছিল, তার প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। শুধু পোষাকপরিচ্ছদ অলংকারেই নয়, বাসগৃহে বা দোকানে যে চিত্রপট টাঙানো থাকে, সে ক্ষেত্রেও তাদের অনুকরণ প্রচেষ্টার মধ্যে যে হীনমন্যতা প্রচ্ছন্ন ছিল, সে প্রসঙ্গে খালদূন বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

অর্থশাস্ত্রকে তিনি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত ভাবেননি। জ্ঞানচর্চার এই দুই শাখাকে তিনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রূপে দেখেছেন। মার্কেন্টাইল মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই বাণিজ্য নয়, উৎপাদনকেই তিনি ধনসম্পদের উৎসরূপে দেখেছেন। একচেটিয়া কারবারের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল। তিনি অনুমোদন করেছেন অবাধ প্রতিযোগিতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং বেড়ে যাবে অন্যান্য পেশার গুরুত্ব। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পরনির্ভর, এ বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। এই তিন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। তা না হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে এবং সহযোগিতার প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। ফরম-এর সঙ্গে ম্যাটার-এর ন্যায় রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অঙ্গাঙ্গি জড়িত বলেই একের বিশৃঙ্খলা অন্যের সর্বনাশের কারণ হয়। খালদুনের মতে

সাধারণভাবে একটি রাষ্ট্র তিন পুরুষের বেশি টেকে না। প্রথম পর্বে বন্য আদিমতা, কঠোর জীবনযাত্রা, সাহস, অভিযানস্পৃহা ও গৌরবলিপ্সা বজায় থাকে। অর্থাৎ সংহতি সহায়ক যাবতীয় গুণাব লি তখন সক্রিয়। দ্বিতীয় পর্বে জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও স্থিতিশীল হবার ফলে আলস্য, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসবাহুল্যের প্রবণতা জাগে। তৃতীয় পর্বে সমস্ত গুণ নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। আরামে লালিত ও বিলাসে আসক্ত হবার ফলে নানা দিকে চারিত্রিক অধোগতি প্রকাশ পায়। সংহতির গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে পড়ে। কোন রাষ্ট্রের পতনের কারণরূপে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন : ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, বিলাস ও আড়ম্বরহেতু মাত্রাধিক ব্যয়বাহুল্য এবং তামসিকতা ও অকর্মণ্যতাজনিত দুষ্ট অভ্যাস।

ইতিহাস চর্চায় বিচ্যুতির নানা কারণ

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সমন্বয় না ঘটলে সার্থক ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব নয়। যেসব কারণে বিচার বিশ্লেষণে নানা বিচ্যুতি এড়ানো যায় না, খালদুন সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন : (ক) বিশেষ আদর্শ বা মতবাদ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব। (খ) প্রাপ্ত উপাদান সম্পর্কে অতি-নির্ভরতা। (গ) দৃষ্ট বা শ্রুত ঘটনার যথার্থ অর্থ অনুধাবনে অক্ষমতা। (ঘ) তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস। (ঙ) ঘটনাপ্রবাহকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার অক্ষমতা। (চ) ক্ষমতাসীন মানুষের তুষ্টি সাধনের লিপ্সা। (ছ) মানব সমাজের রূপান্তর বা গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে সব নিয়ম, সেগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা। (জ) কিছু কিছু বিষয়ে মানবচরিত্রের স্বাভাবিক অতিশয়োক্তি প্রবণতা।

জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হলে সতর্কতার সংকেত হিসাবে খালদুন প্রদত্ত ঐ তালিকার গুরুত্ব অপরিমেয়।

মূল্যায়ন

মধ্যযুগের ইসলামি সভ্যতার ভাণ্ডারে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইবনে-সিনা, দার্শনিক প্রবর ইবনে-রসদ বা এবার রস ও আল গজ্জুলির অবদান সুবিদিত। ইউরোপের দার্শনিক চিন্তাধারায় তাঁদের প্রভাব অতি স্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানানুশীলনের পরিমণ্ডলে সমাজতত্ত্বের কোন স্থান ছিল না। সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় খালদুন ছিলেন অগ্রণী। অ্যারিস্টটলের পর এবং ম্যাকিয়াভেলির আগে তাঁকেই আমরা সর্বাগ্রগণ্য সমাজবিজ্ঞানীর মর্যাদা দিতে পারি। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, দু'তিন শতক আগে জন্মালে তাঁর সৃষ্টি লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপের

জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পেত। দু'শতক পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটলে ইউরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে তিনি তাঁর সাধনা ও সৃষ্টিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন। স্বদেশে ও বিদেশে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে তিনি অপরিচিত ছিলেন। কল্পনার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও মনীষায় টয়েনবি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে থুকিডিডিস, ম্যাকিয়াভেলি ও ক্লারেনডনের সমকক্ষ মনে করেছেন। টয়েনবি তাঁর কীর্তিকে সর্বকালের ও সর্বদেশের সর্বোত্তম সৃষ্টিরূপে অভিনন্দিত করেছেন। সুশোভন সরকারের ভাষায়,

> "ইবনে খালদূনের মতে ইতিহাস মানব সভ্যতার বিবরণ, সমাজের রূপে যে পরিবর্তন আসে, তার কাহিনী, সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপরের সংঘাত ও বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের পুনর্গঠন অথবা এক যুগ থেকে যুগান্তরের আলেখ্য। অর্থাৎ সমাজের রূপান্তরেই ইতিহাসের গতি, সেই রূপান্তরের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রাণ" (অতীত ও বর্তমান, *সমাজ ও ইতিহাস*, বাক প্রকাশনী ১৩৬৪, পৃ: ১৭৫)।

এ কারণে ইতিহাস চর্চায় পথের সন্ধানে, বার বার আমাদের আশ্রয় খুঁজতে হবে ইবনে খালদূনের সাধনা ও সৃষ্টির মধ্যে।

তৃতীয় অধ্যায়
ইন্দোনেশিয়ায় গণআন্দোলন
জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদ

সুকর্ণর ত্রিশরণ মন্ত্র

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে "ন্যাশনালিজম, ইসলাম অ্যাণ্ড মার্কসিজম" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুকর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ Suluh Indonesia Muda (The Torch of Young Indonesia) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয় ১৯৬৯ সালে। এখানে সুকর্ণর বক্তব্যের সারকথা আলোচনা করছি।

এশিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে উত্তাল। এশিয়া অপরাজেয়। সদা জাগ্রত এশিয়ার আত্মা অনির্বাণ শিখার মতো। ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার একটি অন্যতম বৃহৎ দেশ। সেখানে গণআন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য : স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই গণআন্দোলন প্রবাহিত ত্রিধারায় : জাতীয়তাবাদ, ইসলামধর্ম ও মার্কসবাদ। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়াকে গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐক্যগ্রন্থি। ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঐক্যগ্রন্থি বন্ধনে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অপরিহার্য অনুঘটক। তাঁর প্রবন্ধে সুকর্ণ প্রাসঙ্গিক গান্ধীবাণী উৎকীর্ণ করেছেন : "For me, my love of my country is part of my love for all mankind. I am a patriot because I am a human being and act as a human being. I do not exclude any one." কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর মতো মহামানব নেই। সুকর্ণ প্রত্যাশা করেছেন, মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতৃত্বের আবির্ভাব নিশ্চয়ই সেখানে ঘটবে। সেই পথ অন্বেষণ ও প্রশস্ত করার জন্যই তিনি সগর্বে আত্মনিয়োগ করেছেন।

১৯০৮ সালের ২০ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুদি উতোমো (Budi Utomo) দল। ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম আধুনিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন। এই দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুখ্যত জাভাকেন্দ্রিক। ডচ শাসনের প্রতি তাদের আচরণ ছিল সতর্ক সহযোগিতামূলক। ১৯১১ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় ন্যাশনাল ইনডিজ

পার্টি (National Indies Party)। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এবং বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা ছিল এই দলের কর্মসূচির প্রধান বিষয়। ১৯২০ সালের ২৩ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারেকাৎ ইসলামের কমিউনিস্ট-বিরোধী নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশন পার্টি (Pertai Sarekat Islam)। সারেকাৎ ইসলাম বিভক্ত হয়ে পড়ে মার্কসবাদী ও ইসলামি, এই দুই ভাগে। সুকর্ণ অনুক্ষণ ভেবেছেন, কীভাবে এই সব বিবাদপ্রিয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যগ্রন্থি গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয়তাবাদ! জাতিত্ব!

ফরাসি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আর্নেস্ট রেনান [Earnest Renan (1823 - 1892)] ১৮৮২ সালে বলেছিলেন, প্রতিটি জাতির নিজস্ব আত্মা আছে, স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তিধর পটভূমি আছে। জাতীয়তাবাদে আছে দুটি অবিচ্ছিন্ন উপকরণ : ঐতিহাসিক পরম্পরাপুষ্ট জনসমাজ এবং এক জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার তীব্র স্পৃহা। এই প্রসঙ্গে সুকর্ণ স্পষ্টোক্তি করেছেন, এক গোষ্ঠী, এক ভাষা, এক ধর্ম, একই ধরনের প্রয়োজন এবং সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা, শুধুমাত্র এইসব উপকরণ থাকলেই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে না, জাতি সৃষ্টি হয় না। এছাড়া সুকর্ণ উল্লেখ করেছেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট তাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কি [Karl Kautsky (1854 - 1938)] এবং বলশেভিক সাংবাদিক ও কমিনটার্ন জ্যোতিষ্ক কার্ল রাডেক [Karl Radek (1885 - 1939)] এর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা। অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের অগ্রণী তাত্ত্বিক অটো বয়ার [Otto Bauer (1881 - 1938)] ১৯০৬ সালে লিখেছেন, একটি গোষ্ঠীতে বা একটি জাতি হিসেবে মানুষ ঐক্যবন্ধ, জাতীয়তাবাদ হল জনগণের এই প্রত্যয় ও চেতনা। এই সব শ্রুতকীর্তি তাত্ত্বিকের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জাতীয়তাবাদ ও আত্মনির্ভরতাবোধ পরস্পর অঙ্গাবন্ধ।

জাতীয়তাবাদের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতাই হল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অহমিকা। ইসলাম এই ধরনের জাতীয়বাদকে ঘৃণা করে। মার্কসবাদ, তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় অর্থেই, আন্তর্জাতিক। সুতরাং জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য। সুকর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী কেন ইন্দোনেশীয় ইসলামধর্মীকে অগ্রাহ্য করবে? কেনই বা তারা ইন্দোনেশীয় মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে? এই প্রসঙ্গে তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখেল (1866 - 1915), মহাত্মা গান্ধী (1869 - 1948) এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (1870 - 1925) যে উদারনৈতিক

জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন জাতীয়তাবাদের দুটি ভিন্নমুখী চারিত্রিক প্রবণতা। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সমন্বয়ধর্মী ও উদারপন্থী। শুধু ইন্দোনেশিয়াতে নয়, এশিয়ার প্রায় সব দেশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ইসলামি আন্দোলন ধনতন্ত্র-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। অভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট থেকে জন্ম নিয়েছে গণআন্দোলনের এই দুই ধারা, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি আন্দোলন। একথাও সত্য, যেকোন দেশেই তার বসবাস হোক না কেন, প্রকৃত মুসলমানের কাছে সেই দেশই তার স্বদেশ, সেই দেশের সেবাই তার ধর্ম। আরব, ভারতবর্ষ, মিশর ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত অভিবাসী মুসলমান ইন্দোনেশিয়ায় বসবাস করে। প্রকৃত ইসলামি অনুশাসন মতে, ইন্দোনেশিয়া তাদের স্বদেশ, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ও কল্যাণ তাদের স্বপ্ন ও সাধনা। এই হল ইসলামি জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি জাতীয়তাবাদ, এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

ইসলাম

একই বাস্তব পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদী আন্দোলন। সুতরাং মার্কসবাদীকে অগ্রাহ্য করার অর্থই হল সহযাত্রী বন্ধুর আন্তরিক সহযোগিতা অস্বীকার করা। চিনের সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন একনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে চিনা কমিউনিস্টরা ছিল তাঁর সহযাত্রী। অন্য দেশেও মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছে ইসলামি দেশপ্রেমিক ও মার্কসবাদী সহযোদ্ধা।

উনিশ শতকের ইসলাম ধর্মের দুজন বলিষ্ঠ ভাষ্যকারের বক্তব্য সুকর্ণ আমাদের গোচরে এনেছেন। একজন হলেন অল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত শেখ মহম্মদ আব্দু [Sheikh Mohammed Abduh (1849 -1905)]। মধ্যযুগের ইসলামি রীতিনীতির প্রতি অচল অটল আনুগত্য নয়, ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় জন হলেন অল-সৈয়দ জামাল অল-দিন অল-আফগানি [Al-Sayyid Jamal al-Din al-Afgani (1838 -1897)]। তিনি ছিলেন বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি প্যান-ইসলাম অর্থাৎ নিখিল ইসলামি আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ইসলামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ও সজাগ করেছিলেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগণকে। সুকর্ণর ইসলামি ধ্যানধারণায় এই দুই চিন্তানায়কের প্রভাব ছিল গভীর। একথা সত্য, ইসলাম বস্তুবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাস করে না।

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মধ্যে ইসলামের আদর্শ আবদ্ধ নয়। আবার একথাও সত্য, ইসলাম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী দায়দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান। ইসলামি জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিকের কীর্তিকাহিনি উদাহরণ হিসাবে সুকর্ণ উল্লেখ করেছেন : আহমদ আরবি পাশা (1839 -1911), মুস্তাফা কামাল পাশা (1874 -1908), মহম্মদ ফরিদ (1868 -1919), আলি পাশা (1815 -1871) ইত্যাদি। মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু ইসলামি সমাজতন্ত্র আধ্যাত্মিক। এই পার্থক্য মেনে নিয়েও বলা চলে, ইসলাম প্রকৃত অর্থেই সমাজতন্ত্র। ইসলাম ধনতন্ত্রবিরোধী, মার্কসবাদও ধনতন্ত্র-বিরোধী। উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ইসলামের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুদখোরদের ইসলাম ঘৃণা করে। ব্যক্তিগত ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় ও অতিলোলুপতা ইসলাম ধর্মে ও মার্কসবাদে নিন্দিত। ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামি আন্দোলন ও মার্কসবাদী আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলন। এই দুই প্রবাহের সাঙ্গীকরণ একান্তই কাম্য।

মার্কসবাদ

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস বিশ্বের সব সর্বহারা শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকতা মার্কসবাদের মর্মকথা। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের এক অভিনব পদ্ধতির সন্ধান মিলেছে মার্কসবাদে। এই পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্র, এমনকি ইন্দোনেশিয়াতেও, অমূল্য উত্তরাধিকার। মানুষ দরিদ্র কেন? প্রতিকারের পথ কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর মেলে ঐ পদ্ধতির আশ্রয় নিলে। ইন্দোনেশিয়াতে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি রাজনীতির ধারা মার্কসবাদ-বিরোধী ছিল। কিন্তু চিনে মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। আফগানিস্তানেও ইসলামি ও মার্কসবাদী গোষ্ঠী অভিন্নহৃদয় সখা।

ইউরোপে ও এশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। এশীয় দেশগুলিতে প্রধান কর্মসূচি স্বাধীনতা অর্জন। একারণে সমাজতান্ত্রিক দলগুলিও এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী। ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি মূলধনের প্রাধান্য। শ্রমিক আন্দোলনও এখানে তাই জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেবে। ইউরোপে ধর্মীয় সংগঠন ছিল প্রতিক্রিয়ার দুর্গ। মার্কসবাদ সেখানে ছিল অবশ্যই ধর্মবিরোধী। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ইসলাম সাধারণ মানুষের ধর্ম, বঞ্চিত, শোষিত, শৃঙ্খলিত মানুষের ধর্ম। ইসলাম এখানে ধনতন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ। ইসলামি আন্দোলন ও মার্কসবাদী আন্দোলন মূলত সমধর্মী।

সুকর্ণ বিলাপ করেছেন, ইন্দোনেশিয়া বিপন্ন, অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, আলোর শিখা অবশ্যই আছে। তা হল গণআন্দোলনে ঐক্যের সাধনা। সম্ভাব্য ঐক্যের গৌরব তিনি পরিকীর্তন করেছেন তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে।

ত্রিশরণ মন্ত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য :

১৯২৭ সালে খ্যাতনামা ডচ বিশেষজ্ঞ এন. ডবলিউ. এফ. ট্রুব (N.W.F. Treub) তৎকালীন ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুনিপুণ বিচারবিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান ডচ অর্থনৈতিক সংস্থার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। ইন্দোনেশিয়া সংকটাপন্ন পরিস্থিতির ভয়াবহ আবর্তে নিমগ্ন। স্থানীয় আদি অধিবাসী ও বহিরাগত চিনা, এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন চলছে। নানা আন্দোলনও ঘটছে। আন্দোলনের তিনটি প্রবণতা খুব স্পষ্টঃ স্বাধীনতার জন্য আকুল আকাঙক্ষা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। এই তিন প্রবণতাকে তিনি জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলাম, এই তিন শিরোনাম শব্দে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, এই সব আন্দোলন ও প্রবণতা ছিল পরস্পর অঙ্গাবদ্ধ। সুকর্ণ ও ট্রুব-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে রুথ ভি. ম্যাকভি লিখেছেন, ১৯২৬ বা ১৯২৭ সালে নয়, এর এক দশক আগে যদি তারা ইন্দোনেশীয় পরিস্থিতির বিচার করতেন, তাহলে তাঁদের দৃষ্টিতে এই তিনটি ধারার স্বতন্ত্র, স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রবাহ ধরা পড়ত না। জাতীয়তাবাদ সেই সময় ছিল অস্বচ্ছ। তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ইন্দোনেশীয় মুক্তি সংগ্রামকে দু'টি ধারা সমন্বিত জটিল অবস্থারূপে বর্ণনা করতেন। এই দুই ধারা হল ধর্মীয় এবং অধর্মীয়। ১৯২৬ বা ১৯২৭ সালে নয়, কিছুদিন পর যদি তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে তাঁদের মনে হত, মার্কসবাদ সেখানে স্বতন্ত্র ধারারূপে অবদমিত। তখন মার্কসবাদ স্বতন্ত্র আদর্শগত প্রবাহ নয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদ ছিল যথার্থই অভিন্ন। কিন্তু পরিস্থিতির গুণগত রূপান্তর ঘটে ১৯২৬ - ২৭ সালে ক্রান্তিলগ্নে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা তখন স্পষ্টতর ভূমিকা নিয়েছিল। ১. ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম; ২. ইন্দোনেশীয় জাতীয় দলের (P.N.I) আবির্ভাব; ৩. ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন দু'ভাগে বিভক্ত : ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও আধুনিকপন্থী। ১৯৪৫ - ৪৯ সালের ক্রান্তি পর্বে ওলন্দাজ ও জাপানি শাসনের অপসারণই ছিল ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গের একমাত্র লক্ষ্য। এই সময়েই স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের নেতৃবর্গের চিন্তাধারাকে গভীর ও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে জাতীয়তাবাদ, ইসলামধর্ম ও মার্কসবাদ।

এই ত্রিধারার প্রবক্তা ছিলেন সুকর্ণ স্বয়ং। ত্রিশরণ মন্ত্রে তিনি সহযাত্রী উচ্চবর্গীয় নেতৃবর্গকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। হতাশাক্লিষ্ট গ্রামীণ মানুষ এবং সর্বহারা বিপ্লবী জনগণকে তিনি তাঁর বক্তব্য শোনাতে চাননি। তাঁর নিজস্ব দল পি. এন. আই. (P.N.I) এর অনুগামী এবং মুসলমান শান্ত্রি (Santri) সমাজকেও তিনি বিশেষ আমল দেননি। এদের প্রাণবান অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি জানতেন, সমাজের যে উচ্চবর্গশ্রেণিকে তিনি সহযাত্রী করতে চেয়েছেন, তাঁরাই তাঁর কাঙিক্ষত গণআন্দোলনের অগ্রদূত। Geertz এই উচ্চবর্গশ্রেণিকে 'Metropolitan super culture' এর ধারকরূপে অভিহিত করেছেন। ভাষাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ইন্দোনেশীয় সমাজ নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তা তিনি জানতেন। ১৯২০-এর দশকে তিনি ভেবেছিলেন, সংহতিনাশক উপাদানকে বিনষ্ট করে নয়, জাতীয় আন্দোলনে তাদের সদর্থক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেই সংহতিসাধন সম্ভব। জাতীয় উচ্চবর্গ শ্রেণিভুক্ত নবজাগ্রত সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মনে ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার স্বপ্ন সঞ্চারিত করতে পারলেই, সেখানে সংহতিসাধন সম্ভব হবে, সার্থক হবে। এই উদ্দেশ্যেই সুকর্ণ ১৯২৬ সালে আলোচ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জননেতা হিসাবে সুকর্ণর আসন ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উচ্চবর্গশ্রেণির উপর তাঁর আস্থা কখনই স্তিমিত হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন নানা রাষ্ট্রে এমন ঘটেছে। নেতৃত্বের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও সামাজিক রক্ষণশীলতা যুগপৎ সক্রিয় ছিল। ১৯৫৯ সালে ১৭ আগস্ট পরিচালিত গণতন্ত্রের (Guided Democracy) রাজনৈতিক দর্শন সুকর্ণ ব্যাখ্যা করেন। ১৯৬৫ সালের ১৮ মে তারিখে তিনি ঘোষণা করেন নিজেকে যাবজ্জীবন রাষ্ট্রপতিরূপে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট সমর্থিত অভ্যুত্থান নিদারুণ ব্যর্থ হয়। এমনকি ১৯৫৯ - ১৯৬৫ কালপর্বেও সুকর্ণ শুধুমাত্র উচ্চবর্গশ্রেণির প্রতিভূ নন, তিনি নিজেকে দাবি করেছেন গণকণ্ঠরূপে (Rakjat/Voice of the people)। সংসদীয় গণতন্ত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু উচ্চবর্গশ্রেণির প্রতিষ্ঠা খর্বিত হয়নি, বরঞ্চ সুরক্ষিত হয়েছে।

সুকর্ণর রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষায় তখন শ্রেণিসংগ্রাম এতটুকু স্থান পায়নি। অথচ সমসাময়িক ইন্দোনেশীয় নেতাদের অনেকেই কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক দর্শনকে আশ্রয় করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি বিচার করে দেখা গেছে, নেতাদের অনেকেই দেশি-বিদেশি আমলাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষাগত কারণে এবং উচ্চাকাঙক্ষার বশবর্তী হয়ে, অনেকেই অনুকরণীয় মনে করেছেন ঔপনিবেশিক জীবনাচরণ। ওলন্দাজ শাসনের পরিবর্তে আত্মকর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা। মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে তাঁরা ব্রতী হননি। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চিরাচরিত স্বার্থদ্বন্দ্ব তাঁদের প্রত্যয়বোধকে প্রভাবিত করেনি। নেতৃত্বের মূল কাজ হল পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। পরস্পরবিরোধী শ্রেনিস্বার্থ নেতৃত্বের জন্মদাতা। কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্ব সবরকম শ্রেণিস্বার্থের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী ও সক্ষম। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত এবং নেতৃত্ব বিশেষ একটি শ্রেণির স্বার্থের পরিপোষক। এই ধারণাকে ইন্দোনেশিয়ায় কার্যকর করতে গেলে পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হতে বাধ্য।

সুকর্ণ যদি মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করতেন, তাহলে বিপ্লবোত্তর কালপর্বে নগরসভ্যতাপুষ্ট উচ্চবর্গশ্রেণির সৃজনশীল ভূমিকা তাঁকে অস্বীকার করতে হত। তাঁর মতে, উচ্চবর্গশ্রেণি ছিল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ও রূপায়ণে প্রধান অঙ্গ, রাষ্ট্রপতি ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে একমাত্র সেতু। এই শ্রেণির ভূমিকা ছিল সর্বাংশে প্রতিনিধিমূলক। তাঁর মতে সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বে এই শ্রেণি ছিল শান্তির দূত। ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক প্রভেদ, গোষ্ঠীগত বিভেদ ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে জটিল। কিন্তু মূল বিভাজন ছিল তিনটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ : ১. বিমূর্ত ভাবাদর্শের ধারক অভিজাত উচ্চবর্গ priyayi শ্রেণি, ২. ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিভূ santri শ্রেণি, ৩. গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রবক্তা abangan শ্রেণি। এই বিভাজন শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য হেতু বিভাজন নয়। সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও প্রসারিত হয়েছিল এই বিভাজন। বিপ্লবী চেতনা কালক্রমে পশ্চিমি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবর্গ শ্রেণির বৃত্তকে অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত বিভাজনের আদর্শগত নামকরণ হয় যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদ। এই আদর্শগত বিভাজনের সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক আনুগত্য বিশেষ সম্পর্কিত। জাভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপরও এই বিভাজনের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সুকর্ণ পরিকল্পিত / পরিচালিত গণতন্ত্রে (Guided Democracy) এই সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ত্রিধারা বিভাজন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। এই স্বীকৃতির স্লোগান হল সুকর্ণর ভাষায় NASAKOM অর্থাৎ "ন্যাশনালিজম, ইসলাম অ্যানড কমিউনিজম"।

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে মধ্য এবং পূর্ব জাভার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের আনুগত্যের সীমানায় নানা হেরফের ঘটেছে। রাজনৈতিক দলগুলি হারিয়ে ফেলেছে তাদের যথার্থ ভূমিকা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জনগণ থেকে। শাসকশ্রেণি অস্বীকার করেছে ত্রিধারার আদর্শগত ও প্রায়োগিক বাস্তবতা। শ্রেণি স্বার্থকেই তারা মেনে নিয়েছে

অবশ্যম্ভাবী প্রবণতারূপে। ১৯৬৫ সালের পর যে চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে সুকর্ণ প্রবর্তিত ও প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সক্রিয় বা বাস্তবানুগ, তার প্রকৃত মূল্যায়ন অদ্যাপি অসম্পূর্ণ। এটা কিন্তু সুনিশ্চিত যে উচ্চবর্গ শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনার মধ্যে ব্যবধান ছিল ক্রমবর্ধমান।

সূত্র নির্দেশঃ

1. Sockarno : Nationalism, Islam, and Marxism Translated by Karel II. Warouw and Peter D. Weldon with an Introduction by Ruth. T. Mevey (mimeographed)
Translation Series.
Modern Indonesia Project
Southcast Asia Program
Cornell University
Ithaca. New York 1969.
2. M.W.F. Treub : *Het gust in Indle* (Haarlem H.D. Tjeenk) Willink & Zoon. 1927. p. 3
3. Hildred Geertz : "Indonesian Cultures and Communities. "in McVcy (ed) *Indonesia* (New Haven : HRAF Press. 1963). pp. 33-38.

চতুর্থ অধ্যায়
জাতিসত্তা একটি বিশ্ব সমস্যা

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে people অর্থে জন, caste বোঝাতে বর্ণ বা জাতি, race বোঝাতে নর বা নরগোষ্ঠী এবং tribe বোঝাতে কোম শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, "ইংরাজী 'race' ও 'people' এই দুটি শব্দ লইয়া নানা প্রকার বিভ্রমের সৃষ্টি ঐতিহাসিকের মধ্যে দুর্লভ নয়।" তাঁর এই "অবশ্য পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক" (যদুনাথ সরকারের মতে) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। এথনিসিটি বা জাতিসত্তার ধারণা তখন প্রচলিত বা সুপরিচিত ছিল না। তাই তাঁর অমূল্য গ্রন্থে এই ধারণার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এখন কিন্তু জাতিসত্তার ধারণা সুপরিচিত ও বহু প্রচলিত। সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই শব্দের যথাযোগ্য প্রয়োগ সম্পর্কে বিভ্রমের অন্ত নেই। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক নানা সমস্যা সমাজবিজ্ঞানীরা জাতিসত্তার বিস্ফোরণরূপে চিহ্নিত করেছেন। জাতিসত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা তাই বিশেষ প্রয়োজন।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাথান গ্লেজার (Nathan Glazer) খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী। জাতিসত্তা বিষয়ে তাঁর গবেষণা অবশ্য অনুধ্যেয়। বিশ্বসমস্যারূপে জাতিসত্তার গতিপ্রকৃতি তিনি আলোচনা করেছেন *দ্য আমেরিকান রিভিউ* পত্রিকায় (উইনটার / স্প্রিং ১৯৭৬) প্রকাশিত "এথনিসিটি : এ ওয়ার্লড ফেনমেনন" প্রবন্ধে। এখানে সেই প্রবন্ধের সারকথা উল্লেখ করছি।

কানাডায় ফরাসিভাষী ও ইংরেজিভাষী জনের মধ্যে বিরোধ আছে। এটা কি ভাষা বিরোধ? না জাতিসত্তার বিরোধ? না স্বাধীনতাকামী অবদমিত জাতির সংগ্রাম? লাতিন আমেরিকার নানা দেশে 'ইনডিয়ান' ও 'স্প্যানিস' মানুষের মধ্যে বিরোধ আছে। তা কি জাতিসত্তার বিরোধ? উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকের মধ্যে আছে নিরন্তর মনোমালিন্য। এটা কি মূলত ধর্মীয় বিবাদ নয়? গ্রেট ব্রিটেনে আছে স্কটিশ ও ওয়েলস স্বাতন্ত্র্যের জন্য আন্দোলন। উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির মধ্যে মনকষাকষি দীর্ঘকালের। কেউ কেউ মনে করেন, এগুলি জাতিসত্তার আন্দোলন নয়, আঞ্চলিক আন্দোলন বলাই ভালো। ক্ষেত্রীয় স্বাতন্ত্র্য যারা দাবি করছে, বা বাড়তি

কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য আন্দোলন করছে তাদের মতে এসব বঞ্চনার কারণ কি? জাতিসত্তার প্রভেদ, না আঞ্চলিক বৈষম্য?

বাদবিসম্বাদের ক্ষেত্রে নরগোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায়, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা (nationality অর্থে) প্রভৃতি অনুঘটক জড়িয়ে থাকে। ইরাকের কুর্দ ও ইরাকির মধ্যে বিবাদ আছে। যদিও উভয়ই ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে নিত্য বিবাদ লেগেই আছে ফিলিপাইনে। এসব বিবাদের মধ্যে প্রকটিত আন্তর্জাতিক বিন্যাস। কারণ, ইরান ও তুরস্কেও কুর্দ ছাড়িয়ে আছে। আবার ফিলিপাইনের মুসলমান ধর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সূত্রে উত্তর বোর্ণিওর মুসলমানদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। উত্তর বোর্ণিও এখন মালয়েশিয়ার অন্তর্গত।

সমাজবিজ্ঞানীরা জাতিসত্তা ব্যবহার করে থাকেন নির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য। সেই সমাজগোষ্ঠীর মানুষ সচেতনভাবে একটি সাংস্কৃতিক পরম্পরার কোন কোন দিক দিয়ে অংশীদার। সমাজগোষ্ঠী নির্ণয় মূলত বংশানুক্রমিক। জাতিসত্তার খুব কাছাকাছি শব্দসম্ভার হল সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (minority group), নরগোষ্ঠী (race), জাতি (nation)। এই সব শব্দের অর্থগত তীক্ষ্ণ তারতম্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। নরগোষ্ঠীর ও জাতিসত্তার সীমারেখা খুবই ক্ষীণ। নরগোষ্ঠী কোথায় শেষ হয়েছে এবং জাতিসত্তা কোথায় শুরু হয়েছে, তা বর্ণনা করা একান্তই দুঃসাধ্য। শারীরিক গঠনের বিচারে সুইডেনের মানুষ এবং ফরাসি ও ইতালিয়দের মধ্যে কিছু তারতম্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই তারতম্য বোঝাতে নরগোষ্ঠী শব্দ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। হিটলারের আমল পর্যন্ত ইউরোপে সাধারণভাবে নরগোষ্ঠী ও জাতি (nation) সমার্থক মনে করা হত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বংশগত চিহ্ন বা লক্ষণের তারতম্য "নরগোষ্ঠী" ধারণার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু জাতিসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের ধারণা নয়, সাংস্কৃতিক পরম্পরাও বটে। কোথাও কোথাও নরগোষ্ঠী ও জাতিসত্তা গোষ্ঠী সমার্থক নয়। ব্রেজিলীয়দের মধ্যে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর মানুষ আছে। সে কারণেই তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি। কারণ অন্যান্য অ-নিগ্রো ব্রেজিলীয়দের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা অতি গভীর। তবু অনেকে মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে ব্রেজিলের নিগ্রোরা জাতিসত্তা পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করবে। এমন প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। সত্যই, ব্যক্তিগত আত্মপরিচিতির ভিত্তি হিসাবে বা সমাজ সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে, অনেক দেশেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে জাতিসত্তা।

ধর্ম সমাজসংগঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কিন্তু ধর্ম ও জাতিসত্তা সমার্থক নয়। ধর্মের প্রাঙ্গনে ধর্মান্তরিত মানুষ আছে, ব্যক্তিগত আনুগত্য আছে। প্রায় সব নরগোষ্ঠী এবং সব জাতিসত্তার মানুষ আছে খ্রিস্টধর্মে, ইসলামধর্মে, হিন্দুধর্মে,

বৌদ্ধধর্মে। কিন্তু সামাজিক মেলামেশার বিশেষ পর্বে ধর্মীয় সত্তা ও জাতিসত্তা একাকার হয়ে মিশে যায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম জন্মগত, ঠিক তেমনি জাতিসত্তাও জন্মগত। হিন্দু পরিবারে জন্মালে হিন্দু ধর্মই তাঁর ধর্ম। লেপচা পরিবারে জন্মালে, লেপচাই হল তাঁর জাতিসত্তা। নির্দিষ্ট দেশকাল পরিধিতে নির্দিষ্ট জাতিসত্তার সঙ্গে নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় নিবিড়ভাবে জড়িত। সুদানে ও চাদে উত্তরাঞ্চলের আরবিভাষী মানুষ ইসলামধর্মের অনুগামী। দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোগোষ্ঠী হয় প্যাগান, না হয় খ্রিস্টান। নাইজেরিয়াতে উত্তরাঞ্চলে হাউসা (Housa) ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হল মুসলমান, কিন্তু ইবো (Ibo) এবং ইওরোবা (Yoruba) গোষ্ঠীর মানুষ খ্রিস্টান। তাই হাউসার সঙ্গে ইবোর দেখাসাক্ষাৎ ঘটলে, হাওসার ধরে নেয় ইবো খ্রিস্টান, এবং ইবোও ভাবে হাউসার মুসলমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পোলাণ্ড থেকে আগত অভিবাসী হল ক্যাথলিক এবং সুইডেন থেকে আগত অভিবাসী লুথেরীয় প্রোটেস্টান্ট।

ধর্মের সঙ্গে জাতিসত্তার বন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই নিবিড়। ধর্ম সংস্কৃতির জনক। এই অর্থে ধর্ম জাতিসত্তারও স্রষ্টা। যখন ধর্মান্তরিতকরণে বা বিজয় অভিযানে প্রমত্ত নয়, তখন ধর্ম সহজ স্বাভাবিক। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে ধর্ম ও জাতিসত্তার মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। কিন্তু জাতিসত্তার সঙ্গে বর্ণের (caste) সম্পর্কে সুস্পষ্ট নয়। বর্ণব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। বর্ণ জন্মভিত্তিক, পেশা বা বৃত্তিভিত্তিক স্তরবিভক্ত সমাজব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার জটিল প্রভাব ভারতীয় সমাজে অদ্যাপি ব্যাপক ও গভীর। জাতিসত্তার আলোকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার জটিলতা বিশ্লেষণ আদৌ কার্যকর নয়।

জাতিসত্তার অর্থগত পরিধি সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়, যদি আমরা প্রশ্ন করি: বলুন ত? কোন গোষ্ঠী জাতিসত্তা গোষ্ঠী নয়? অর্থাৎ শব্দটির অর্থগত কোন সীমারেখা আছে কি? নিশ্চয়ই আছে। প্রথমত, রাষ্ট্র জাতিসত্তা গোষ্ঠী নয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক শ্রেণি ও জাতিসত্তা সমার্থক নয়। এই দুই প্রশ্নেও বিতর্ক আছে।

অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র (state) বোঝাতে জাতি (nation) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় জাতি (nation) অর্থে নির্দিষ্ট জাতিসত্তা গোষ্ঠী বোঝানো হয়েছে। রাষ্ট্র হল 'জাতি' ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন। কে নাগরিক এবং কে নাগরিক নন, তা স্থির করে এই প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন। উনিশ শতকের বিশেষ পরিস্থিতিতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের আর্বিভাব ঘটেছে জার্মান ও ইতালি রাষ্ট্রে। অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে জাতিসত্তাভিত্তিক রাষ্ট্র, যথা, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া এবং আলবানিয়া। জাতিসত্তার ভিত্তিতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য বহু বিভক্ত

হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন জাতি (American nation) কথাটি ব্যাপক অর্থে প্রচলিত। অগণিত অভিবাসীও মার্কিন জাতির অন্তর্গত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ (National self-determination) নীতি ঘোষণা করেন, রাষ্ট্র সংগঠনের চরিত্র যাই হোক না কেন, এই নীতিকে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক জাতিসত্তা গোষ্ঠীর নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের অধিকার থাকা সংগত। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে এটাই ঘটেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির জাতিসত্তার ভিত্তিতে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তা গোষ্ঠী ছিল, তারা দাবি করেছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমজাতিসত্তা সমন্বিত রাষ্ট্রগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে জাতিসত্তার প্রশ্নে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের নানা দেশে বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে। এটা সম্ভব হয়েছে ব্যাপক অভিবাসন হেতু। পশ্চিম জার্মানিতে এসেছিল ২.৪ মিলিয়ন শ্রমজীবী মানুষ। তারা এসেছিল প্রধানত তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি এবং গ্রিস থেকে। সেখানে মোট শ্রমিক সংখ্যার ১২ শতাংশ ছিল বহিরাগত শ্রমিক। সংখ্যার আনুপাতিক হারে সুইজ্যারল্যাণ্ডে বহিরাগত শ্রমিক সংখ্যা আরও বেশি। আলজেরিয়া, স্পেন ও পর্তুগাল থেকে ফ্রান্সে এসেছে বিদেশি শ্রমিক। প্রায় চিরস্থায়ী কালা আদমি শ্রমিক এসেছে ইংল্যাণ্ডে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ থেকে। অভিবাসী শ্রমিকের আইনগত স্বীকৃতিতে তারতম্য অবশ্যই আছে সব দেশে। প্রতিটি দেশেই সমরূপ জাতিসত্তা ছিল। নিরন্তর অভিবাসনের ফলে তা অসমরূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

সমরূপ জাতিসত্তার সন্ধানে বর্মা থেকে ভারতীয়রা বহিষ্কৃত হয়েছে। উগান্ডা থেকে এশিয়ার নানা দেশের মানুষ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে বিপুল সংখ্যায় ইহুদি সম্প্রদায় হয়েছে বিতাড়িত। বহিষ্কার ও বিতাড়ন নীতির ফলে অন্যান্য দেশে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত এশীয় মানুষজন ব্রিটেনে ও ইউরোপের নানা দেশে ভিড় করেছে, স্বাদ পেয়েছে নতুন জীবনের, গড়ে তুলেছে অসমরূপ জাতিসত্তা। পূর্ব ইউরোপ থেকে বিতাড়িত ইহুদি সম্প্রদায় ইজরায়েলে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্টি হয়েছে দুঃসহ প্যালেসটিনীয় সমস্যা। বিতাড়ন বা বহিষ্কার নীতি কোথাও ফলপ্রসূ হয়নি। এযুগের বিশ্বে কোন দেশেই সমরূপ জাতিসত্তা আদৌ সম্ভব নয়। কল্যানধর্মী সমাজের ধ্রুব সত্য হল বহুবচন জাতিসত্তা। বহুজাতিক জাতিসত্তাই হল রাজনৈতিক সুনীতি চেতনা ও ন্যায়বোধের প্রধান মানদণ্ড এবং বিশ্বজনীনতার ভিত্তিভূমি। ভারতবর্ষ অসমরূপ বহুবচন জাতিসত্তার বর্ণাঢ্য

মিলনতীর্থ। কালিদাস নাগকে লিখেছেন রোঁমা রোঁলা ১৯২৫ সালে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে জাতিসত্তার আকাঙক্ষা প্রসঙ্গে :

It is necessary in whatever we write and think to place ourselves on a universal plane. There are not, there cannot be any dual standard of political morality in Europe and in India. Everyone who suffers for justice, all the martyrs of justice, belong to both of us.

এই বাণী নিত্য সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তবুদ্ধির মুক্তধারা

আলোচনার শুরুতেই একটা গল্প শোনাচ্ছি। সেন্ট আইভো চলেছেন সেন্ট লুইসের উদ্দেশে। পথে দেখলেন, একজন বিষণ্ণ প্রৌঢ়া রমণীও চলেছেন সেই পথ দিয়ে। সেই রমণীর এক হাতে জলপাত্র, অন্য হাত প্রজ্বলিত মশাল।

সেন্ট আইভো তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রমণী জানালেন, আগুন দিয়ে স্বর্গকে তিনি দগ্ধ করতে চান আর জল দিয়ে নির্বাপিত করতে চান নরকের আগুন। স্বর্গের লোভ নয়, নরকের ভয় নয়। ঈশ্বরকে (অর্থাৎ সত্যকে) পেতে হবে শুধুমাত্র ঈশ্বরকে প্রীতির জন্যই অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠার জন্যই।

রেজাউল করীম প্রসঙ্গে গল্পটি মনে এলো। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁর চরণাশ্রিত ছিলাম। স্বচক্ষে দেখেছি এবং নিরন্তর মনের গহন গভীরে অনুভব করেছি রেজাউল করীমের স্বভাবে কোন অর্থেই লোভ এবং ভয় এতটুকুও স্থান পায়নি। প্রকৃষ্ট অর্থে তিনি ছিলেন মুক্তমনা যুক্তিশাসিত জ্ঞানানুসন্ধানী এবং সত্যব্রতস্নাতক। স্বভাবগুণেই তিনি ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত এবং ধর্মান্ধতাবিরোধী। পারিবারিক পরিবেশে তা পরিপুষ্ট হয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বতোমুখী বিকাশের সুলগ্নে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয়েছে স্বদেশ সেবা, স্বরাজ সাধনা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়মুখী সাহিত্যচর্চার নব নব প্রাঙ্গণে।

লেকির প্রভাব

একটি গ্রন্থ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। *History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe* (ইউরোপে যুক্তিবাদের উদয় ও প্রভাবের ইতিহাস)। এই মহামূল্য গ্রন্থটির লেখক William Edward Hartpole Lecky (উইলিয়ম এডওয়ার্ড হার্টপোল লেকি)। ১৯২০ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। লেকি সম্পর্কে তিনি কোন প্রবন্ধ রচনা করেননি। অন্যান্য প্রসঙ্গেও জানাননি লেকির মতামত। কিন্তু আলাপআলোচনায় লেকির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ বহুবার তিনি শুনিয়েছেন।

১৯৯৩ সালের ১৮ নভেম্বর *আজকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শেষ লেখায় "এই ভারতের স্বপ্ন কি দেখেছিলাম?" প্রবন্ধে রেজাউল করীম জানাচ্ছেন, "রাজনীতিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে হবে, এই ছিল আমার ভাবনা চিন্তার মূল কথা। লেকির একটি গ্রন্থ History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমি বরাবর এই মত পোষণ করেছি রাজনীতিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখতে হবে।"

ঐ গ্রন্থটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি রেখাঙ্কিত করেছিলেন। বইটি যখন তিনি আমাকে পড়তে দেন, ঐ দাগাঙ্কিত অংশগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে বলেন। সেই সব অংশ আমি লিখে রেখেছিলাম। এই প্রবন্ধে লেকির যুক্তিবিন্যাসের সারমর্ম আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

বেকন, দেকার্তে এবং লক প্রমুখ চিন্তানায়কগণ প্রকৃত অর্থে যুগপ্রবর্তক। পথ প্রদর্শকরূপে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন স্বদেশে এবং স্বকালে বিশেষ ধরণের মানসিক গঠন; বৌদ্ধিক অনুশীলন, বিশ্লেষণের যুক্তি-নিপুণ পদ্ধতি এবং অনুসন্ধানের সৃজনাত্মক প্রবণতা। সুনির্দিষ্ট নীতি, সিদ্ধান্ত ও সমালোচনা যুক্তিবাদের নিষ্কর্ষ নয়। যুক্তিবাদের মমার্থ হল ভাবনাচিন্তার এক ধরণের গঠন বা কাঠামো বা ছাঁচ অথবা তর্কবিতর্ক ও বিশ্লেষণের প্রবণতা। যুক্তিবাদী মানুষের দৃষ্টিতে যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা অনুশাসিত হবে ধর্মশাস্ত্রের গোঁড়ামি। এর ফলে মানবজীবনের উপর ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব হবে সীমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষ ভাবতে শিখবে ইতিহাসে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা অলৌকিক নয়। সব কিছুই ঘটে প্রাকৃতিক কারণে। মানুষের অন্তরের গহন গভীরে যে ধর্মীয় আবেগ তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তারই প্রতিফলন ঘটে নানা ধর্মব্যবস্থায়। নীতিশাস্ত্রের সারকথা হল বিবেকের কাছে যা কিছু অনুমোদনযোগ্য তাই অভিব্যক্ত হয় কর্তব্যকর্মরূপে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে এসব কথা প্রচারের ফলে ইউরোপে সাধারণ মানুষের চিন্তার জগতে ওলটপালট ঘটেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে নতুন অনুরাগবিরাগ। যুক্তিশাসিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে ইউরোপের মানুষ প্রত্যাখান করেছিল চিরাচরিত ভাবনাচিন্তা ও অভ্যাস-আচরণ। যুক্তিবাদের ইতিহাসে যে সব ভাবনাচিন্তা লেকি সুপ্রকাশ করেছেন, তার সারমর্ম সংক্ষেপে এখানে নিবেদন করলাম।

জন স্টুয়ার্ট মিলের আদর্শ

মুক্ত বুদ্ধির প্রবক্তা হিসাবে জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) আদর্শ রেজাউল করীম পরম উৎসাহে প্রচার করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির

মুখপত্র হিসেবে *গণরাজ* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৮ সালের ১৪ এপ্রিল। রেজাউল করীম ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে এই পত্রিকা ছিল খুবই জনপ্রিয়। ১৯৪৯ সালে এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি" শিরোনামে রেজাউল করীম লিখিত একটি উদ্দীপক প্রবন্ধ। স্বাধীন চিন্তার সমর্থনে জন স্টুয়ার্ট মিল "অন লিবার্টি" (On Liberty) শিরোনামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে রেজাউল করীম বিশ্লেষণ করেছিলেন মিলের যুক্তির সারমর্ম। রেজাউল করীমকৃত সারমর্ম নিচে উদ্ধৃত করছি।

১. "যাঁহারা প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হন, তাঁহারা ভ্রান্ত নাও হইতে পারেন। যে সব মতবাদকে মিথ্যা মনে করিয়া মানুষ বলপূর্বক দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা সত্যও হইতে পারে। এই সব নতুন মতবাদকে অসত্য বলার অর্থ হইতেছে মানুষ যে ভুল ভ্রান্তির অতীত এই ধারণাকে বিশ্বাস করা। কিন্তু কোন যুগের কোন মানুষই ভুল ভ্রান্তির অতীত নহে।"

২. "ভুল ও অসত্য মনে করিয়া যে সব মতবাদকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় তাহার মধ্যে আংশিক সত্যও থাকিতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত মতবাদ, ধারণা, বিশ্বাস ও আচারবিচার অনেক সময় সর্বাংশে ও সমগ্রভাবে সত্য হয় না। বিপরীত মত, বিশ্বাস ও ধারণার সংঘর্ষ ও তর্কবিতর্কের দ্বারাই বাকী সত্যটুকু পাওয়া যাইতে পারে ও মিথ্যাটুকু অপসারিত হইতে পারে।"

৩. "প্রচলিত মতবাদ ও বিশ্বাসটি যদি সত্য হয়, এমনকি সর্বাংশে সত্য হয়, তাহা হইলেও উহার বিরুদ্ধ মতবাদ ও বিশ্বাসকে দাবাইবার কোন প্রয়োজন নেই। যদি এই সমগ্র সত্য মত ও বিশ্বাসকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিমার দ্বারা প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে যাহারা এই মত ও পথকে সমর্থন করে তাহারা ইহার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও নৈতিক যুক্তি সম্বন্ধে কস্মিনকালে কোনও ধারণা করিতে পারিবে না। বিনা বিচারে বিশ্বাস ও সমর্থন করিতে মানুষ এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে যে তাহার সত্যমত, বিশ্বাস ও ধারণা পরিশেষে একটা অর্থহীন সংস্কারে পরিণত হইবে। তাহার ফলে সত্যের আলোকে তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইবে না।"

৪. "বিচার বিশ্লেষণ প্রতিবাদ ও সমালোচনার সুযোগ না পাইলে প্রত্যেকটি মতবিশ্বাস ধারণা কালক্রমে মানুষের অজ্ঞাতসারে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে, তখন মানুষের চরিত্র, আচরণ ও জীবনের উপর সত্যের প্রাণদায়ী প্রভাব হ্রাস পাইয়া যাইবে। তাহার অন্তর হইতে কল্যাণপ্রদ সত্যের জ্যোতিঃ নির্বাপিত হইবে। তাহার সেই মত ও বিশ্বাসকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে

হৃদয়স্পর্শী, জীবন্ত, জ্বলন্ত, বাস্তব বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির অভাবে মানুষের জীবন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ও অর্ধমৃত হইয়া যাইবে।"

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষের শোচনীয় দুর্দশা দেখে রেজাউল করীম মর্মাহত হয়েছিলেন। সমাজের কোন বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ নেই। আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করার কোন স্পৃহা নেই। তিনি অনুভব করেছিলেন, সমাজে ধর্মের নামে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের জাঁকজমক আছে, ধর্ম ও মতবাদের নামে হৈ চৈ করার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু এসবের মধ্যে প্রাণ নেই, জীবন নেই, নেই যুক্তির জ্বলন্ত শিখা। বিশ্বাসের অর্থ এখন dogma বা সংস্কারমাত্র। লোকে বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। এই প্রবন্ধের উপসংহারে উদাত্ত কণ্ঠে রেজাউল করীম আমাদের সচেতন করেছেন:

"আজিকার যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্মনৈতিক আদর্শের উন্নতি করিতে হইলে, বিশ্বাসকে যুক্তি ও সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মন ও হৃদয়কে উন্নত করিতে হইলে, চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির আশ্রয় হইতে হইবে। কেবল প্রাণহীন বুলি আওড়ালে, ঘন ঘন জিন্দাবাদের স্লোগান তুলিলে দেশ ও জাতির উন্নতি হইবে না। সমাজে তরুণগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হয় ও বিরুদ্ধ মতবাদকে সহ্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি ব্যতীত এ জাতির সত্যকার মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হইবে না।"

বৃদ্ধ বয়সেও রেজাউল করীমের জীবনে জন স্টুয়ার্ট মিলের সারস্বত চর্চার প্রভাব ও আকর্ষণ এতটুকুও হ্রাস পায়নি। ১৯৮৫ সালে বহরমপুর গার্লস কলেজের বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি প্রবন্ধ 'জন স্টুয়ার্ট মিল' শিরোনামে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি আক্ষেপ করেছেন, এ যুগের তরুণ সম্প্রদায় স্বাধীনতাজাত নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তারা মিলকে চেনে না, জানে না। মিলের বহু তত্ত্ব আজ অচল। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর মাত্রাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সমাজতন্ত্রবাদ অস্বীকার করেছেন। রেজাউল করীম লিখেছেন, "তবুও তাঁহার নীতি ও মতবাদ হইতে এখনও শিক্ষণীয় বহু উপাদান পাওয়া যাইবে যাহা আমাদের নবজাগ্রত জাতির জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। শাসনযন্ত্রের নানাবিধ বিধিনিষেধের চাপে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন লোপ পাইতে থাকে তখন মিলের অমূল্য গ্রন্থ Liberty-র কথা ভুলিতে পারি না। এই গ্রন্থখানি ব্যক্তি স্বাধীনতার একখানি প্রামান্য গ্রন্থ।"

পিতা জেমস মিলের কাছেই পুত্র জন মিলের শিক্ষারম্ভ হয়। জীবনের যাত্রারম্ভেই জন মিল গ্রিক চিন্তাধারার ভক্ত হয়ে পড়েন। চৌদ্দ বছর বয়সে ফ্রান্সে যান তিনি এবং বিখ্যাত দার্শনিক বেনথামের গৃহে অতিথি হন। তখন বেনথামই হলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। ১৮২৬ সালে জন মিলের জীবনে আসে গভীর মানসির সংকট। হতাশায় তিনি পীড়িত হন। তাঁর ভাবজগতের এই সংকট রেজাউল করীম হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন:

"পিতার যুক্তিবাদী কঠোর অনুভূতিশূন্য (non-emotional) শিক্ষার প্রভাবে থাকিয়াও তাঁহার অনুভূতিপূর্ণ প্রকৃতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবাবেগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আরও উপাদান খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতার নিকট তাহা পাইলেন না। তাহা তিনি পাইলেন কবি Wordsworth-এর কবিতার মধ্যে। আর পাইলেন Coleridge-এর দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে। এইসব ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা ও প্রবন্ধ পড়িয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মন শান্ত হইতে লাগিল। একদিকে অনুভূতি ও ভাবাবেগপূর্ণ অন্তর এই দোটানা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া মিল যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ও চিন্তাধারার মধ্যে একটি বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংল্যাণ্ডের মানসিক জগতে যেন সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষের আবির্ভাব হইল। এ মানুষের আছে গভীর সহানুভূতি, চিন্তার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধিজাত উদার দূরদর্শিতা। নিত্যকালের মানুষের জন্য একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি, আবেগ অনুরাগ ও বুদ্ধির সমন্বয় থাকা দরকার। এই কথাটি তিনি অনুভব করিলেন। মানসিক ও চিন্তাগত এই পরিবর্তন তাঁহার মনের এই অবস্থাকে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় মিল লিখিত ধর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ (Three Essays on Religion)। প্রথম জীবনে মিল ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী। এই গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন চিন্তা বিশ্লেষণ করেন। রেজাউল করীমের ভাষায়, "এই গ্রন্থে যেন আমরা একজন নূতন মিলকে দেখতে পাই।" ১৮৬৬-৬৮ কালপর্বে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একটি দলের প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু পার্লামেন্টে অকুণ্ঠচিত্তে নিজস্ব মতামত তিনি প্রকাশ করতেন। পার্লামেন্টে তিনটি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন : শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ, নারীর অধিকার এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্রজাদের জন্য ভূমি-সংস্কার। কিন্তু ভারতবর্ষে মিলের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেজাউল করীম। তিনি লিখেছেন :

> "উপসংহারে এইটুকু বলিব যে, মিলের বহু আদর্শ ও নীতি এখনও অচল হয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতের যুবকগণকে মিলের রচনাবলী পড়িবার

জন্য আহ্বান করি। স্বাধীন চিন্তা, ক্ষুরধার যুক্তি, ভাষার দৃঢ়তা, উদার মনোভাব ও গোঁড়ামিশূন্য মতবাদের আজ ভারতে খুবই প্রয়োজন। মিলের রচনা আমাদের যুবকগণকে এই সবই প্রদান করিবে। মিলকে অগ্রাহ্য করিলে স্বাধীন চিন্তাকেই অগ্রাহ্য করা হইবে। মার্ক্সের মতো মিলও তরুণদের হাতে হাতে থাকা চাই।"

সাহিত্যের আদর্শ ও বঙ্কিম বন্দনা

জাগৃহি (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের অন্তর্গত "ধর্ম ও সাহিত্য" অধ্যায়ে রেজাউল করীম কালজয়ী সাহিত্য ও অমর কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা সুব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় এখানে তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করছি:

১. সাহিত্যরথিগণ ও মহাকবিগণ আপনাদের কল্পনার প্রভাবে সাধারণের সম্মুখে এমন আদর্শ রাখিয়া যান, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদিগকে পথের আলো দেখাইতে থাকে, মরীচিকার মধ্যে সুনিশ্চিত গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। শৌর্য, বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, ন্যায় ও সত্য প্রভৃতি মহাগুণের প্রকৃত আদর্শ ও পরিচয় আমরা পাই, কবির চিত্রিত আলেখ্যে। আর সেই আলেখ্য আমাদের নয়নের সম্মুখে সমুজ্জ্বল জোতিষ্কের মত সতত জ্বলজ্বল করিতে থাকে, তাহারই প্রভাবে আমরা আদর্শের সন্ধান পাইয়া থাকি। (তদেব, পৃ: ২)।

২. মানুষের নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণ সাধনের কৃতিত্ব ধর্ম-সংস্থাপকের একার নহে। ইহাতে সাহিত্যের দানও অতুলনীয়। জগতে ন্যায়, নীতি, সত্য ও সামাজিক নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য যাহা করিয়াছে, তাহা ধর্ম-সংস্থাপকের দান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি, ফেরদৌসী তাঁহাদের অমর তুলিকায় যে সব পুণ্যচরিত্রের আলেখ্য আঁকিয়াছেন, তাহা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ও মানবের চরিত্রোন্নতিতে কোনও মহাপুরুষের দান হইতে কম মূল্যবান নহে। (তদেব, পৃ: ৫)।

৩. ....সাহিত্য কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামগ্রী নহে, কোনও ধর্মের বাহনও নহে, সাহিত্যের দ্বারা মিশনারী প্রচারকের কাজ চলিবে না। সাহিত্যের নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য কেবল তাহাই প্রচার করিবে। সুতরাং হিন্দু-সাহিত্য, মুসলিম-সাহিত্য, খৃষ্টান-সাহিত্য প্রভৃতি কথার কোনও মূল্য নাই—উহা অলীক ও পরস্পর বিরোধীভাব। শেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলী, কীট্স, ব্রাউনিং—ইঁহারা খ্রিস্টান; কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা হিন্দু;

> *এবং সাদী, হাফেজ, ফেরদৌসী—ইঁহারা মুসলমান। কিন্তু ইঁহাদের রচিত সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ—তাহা খ্রিস্টানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয় (তদেব, পৃ: ৮)।*

বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণ (সাহিত্য সমালোচক হিসাবে) রেজাউল করীমের প্রজ্ঞা-দৃষ্টির প্রভায় দ্যুতিময়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*। এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত হয়েছে কাজী আবদুল ওদুদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ। *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ গ্রন্থ* থেকে রেজাউল করীমের যুক্তিশাণিত সিদ্ধান্তসম্ভারের কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করছি। "বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র" অধ্যায়ে রেজাউল করীম জানিয়েছেন:

১. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে ইসলামকে স্পর্শ করেননি। গালি দেওয়া ত' দূরের কথা।

২. বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "হৃতশক্তি স্থবির নবাব মীরজাফরের ছিল না শাসন করার ক্ষমতা, ছিল শোষণ করার প্রলোভন।" রেজাউল করীম লিখেছেন, এই উক্তির মধ্যে মুসলমান জনসাধারণ সম্পর্কে বঙ্কিমের বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁর বিদ্বেষ ছিল বাংলার শত্রুদের সম্পর্কে, তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক। কারণ বাংলা ছিল বঙ্কিমের প্রিয় প্রাণাধিক জন্মভূমি (পৃ: ৩৪)।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:

   সীতারাম চাহিয়াছিলেন একটা নতুন রাজ্য গঠন করিতে। ...সে রাজ্যে হিন্দু থাকিবে, মুসলমান থাকিবে। তাই তাহার নাম হইল মহম্মদপুর। অর্থাৎ বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক। ইহাই সীতারামের মূল কথা (পৃ: ৩৯)। সীতারামের স্বপ্নের ভারতের জন্যই রেজাউল করীম ছিলেন আজীবন সত্যাগ্রহী সংগ্রামী।

৪. রেজাউল করীম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মোগল পাঠান বঙ্কিম সাহিত্যে বিদেশী শাসক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "রাজসিংহ ও সীতারাম ছিলেন স্বদেশভক্ত বীরদের আদর্শস্বরূপ।" মেকলে চেয়েছিলেন বাঙালিকে সাহেব করে গড়ে তুলতে। "কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অগাধ স্বদেশপ্রীতির প্রভাবে মেকলের আশা চূর্ণ করিয়া দিলেন" (পৃ: ৪০)।

৫. রেজাউল করীম তাঁর গভীর প্রত্যয় সুপ্রকাশ করেছেন:

   স্বদেশী কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ধাপে বঙ্কিমসাহিত্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই

> বাংলাকে তথা ভারতকে তিনিই শিখাইয়াছিলেন—কেমন করিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণ বলিদান করিতে হয়। যুবশক্তিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি আনয়ন করিয়াছিলেন।...আজ যে হিন্দু-মুসলমানে রেষারেষি চলিতেছে, তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ দায়ী নহেন। দায়ী পরবর্তীযুগের শাসকবর্গের কূট রাজনীতি (পৃঃ ৪৪)।

"বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবে হিন্দু মুসলমান সবাই গৌরবান্বিত। এই প্রসঙ্গে তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন কামাল আতাতুর্ক ও রেজা শা পাহলবীর উদাহরণ। স্ব স্ব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাক-ইসলাম যুগের সংস্কৃতি তাঁদের নিকট ছিল আদরণীয়। রেজাউল করীম লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ইহা শুধু এজন্য নয় যে, তিনি হিন্দু বরং এই জন্য যে তিনি ভারতবাসী" (৫০ পৃঃ)। "কৃষকবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক অধ্যায়ে রেজাউল করীম আমাদের জানিয়েছেন, মাতৃভাষায় বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম কৃষক ও সাম্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। "কিষাণসভা ও শ্রমিক সমিতি গঠিত হইবার বহু পূর্বে বাংলার কৃষকদের জন্য যা কিছু লিখেছেন, তা ছিল যুক্তি ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ" (পৃঃ ৫৭)। 'আনন্দমঠের অমৃতময় ফল' অধ্যায়টি স্বদেশ ভাবনায় চিরভাস্বর। দেশ তখন জড়তা ও অবসাদে নিদ্রাচ্ছন্ন। দাসত্বের অভিশাপে ক্লীব। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। তাঁর অমর গ্রন্থ **আনন্দমঠ**-এ ঠিক সেই যুগ বঙ্কিমচন্দ্র তূর্য নিনাদে স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করেন। "বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে আছে **আনন্দমঠ**-এর পূর্ণ প্রভাব। আগে **আনন্দমঠ**, পরে স্বদেশী আন্দোলন। খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত **আনন্দমঠই** দেশবাসীকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াছে।" (পৃঃ ৬৭-৬৮)। দেশের জন্য আত্মত্যাগের নিদর্শনকে "**আনন্দমঠ**"-এর অমৃতময় ফল বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল বা অন্যায় হইবে না" (পৃঃ ৭৫)।

১৯৩৭ সালে অত্যুৎসাহী মুসলিম লিগপন্থীরা মহাসমারোহে প্রকাশ্যে কলকাতায় **আনন্দমঠ** উপন্যাসের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে এবং ওই গ্রন্থের অসংখ্য কপি দাহ করে। "আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব" শীর্ষক অধ্যায়ে অভিব্যক্ত হয়েছে রেজাউল করীমের অগ্নিবর্ষী লেখনী। তিনি লিখেছেন,

> স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে। দৃশ্যত মনে হইল আনন্দমঠ ভস্মীভূত হইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভস্মীভূত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি, ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের আত্মসম্মান ও সুমহান মহিমায় স্পর্দ্ধিত আনন (পৃঃ ৮২)।

জিন্না, নাজিমুদ্দিন, আক্রাম খাঁ প্রমুখ কয়েকজন রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী ফতোয়া জারি করেছিলেন যে 'বন্দেমাতরম' গানটি ইসলামবিরোধী। ১৯০৬-১৯১১ কালপর্বে বন্দেমাতরম্ গানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। খিলাফতের যুগে মৌলানা আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, জাফর আলি, হসরত মোহানি প্রমুখ নেতৃবর্গ তখন গানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাননি। রেজাউল করীমের প্রশ্ন : "১৯৩৭ সালে হঠাৎ কি এমন ঘটিল যাহার জন্য বন্দেমাতরম্ ইসলাম বিরোধী হইয়া উঠিল?" উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরূদ্ধে যে বিভেদপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সেই আন্দোলনেরই অন্য রূপমাত্র (পৃ: ৯৩-৯৪)। 'ইসলাম ও বন্দেমাতরম্" শীর্ষক অধ্যায়ে মুক্তমনা রেজাউল করীম লিখেছেন, "এই প্রকার ফতোয়ার চাপে মুসলমানগণ স্বাধীন পরিবেষ্টন বা আবহাওয়া পাইতেছে না. তাহাদের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ হইয়া উহার বিকাশ হইতেছে না" (পৃ: ১০৪)। গ্রিস রোম, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল ইসলামি সভ্যতা। একেশ্বরবাদ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও পৌত্তলিকতার ভয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মুসলমান সমাজ এইসব সভ্যতার ভাল ভাল আদর্শ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। আরবি ও ফারসি সাহিত্যের বহু মুসলমান লেখক পৌত্তলিক ভাবাপন্ন অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে ইকবাল, হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন (পৃ: ১১২)। রেজাউল করীমের বীজমন্ত্র ছিল— হুবুল ওয়াতানে মিনাল ইমাম। অর্থাৎ দেশপ্রেম মুসলমানের কাছে ইমানের (ধর্মবিশ্বাসের) অঙ্গ। সুতরাং বন্দেমাতরম্ গানে যেভাবে দেশবন্দনা করা হয়েছে তা ইসলাম-বিরোধী নয়। অন্যান্য গ্রন্থে ও অসংখ্য প্রবন্ধে রেজাউল করীমের সাহিত্য ভাবনার মহামূল্য মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বল হয়েও আছে তাঁর উদার মনের স্নিগ্ধতা, এবং যুক্তিবিন্যাসের প্রাখর্য।

১৯৩৭ সালে মুসলিম লিগপন্থী বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী নেতা প্রশ্ন তুলেছিলেন: বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিদ্বেষী? 'বন্দেমাতরম' গানের মাতৃবন্দনা কি ইসলাম-বিরোধী? মুসলিম লিগের উগ্র অনুগামীরা প্রকাশ্যে পরম উৎসাহে দাহ করেছিল **আনন্দমঠ** উপন্যাস। বঙ্কিম সাহিত্যের নানাদিক বিশ্লেষণ করে তাঁকে মানবতার উদগাতারূপে স্তুতি নিবেদন করেন কাজী আবদুল ওদুদ:

> কিন্তু মুসলমান নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের অপবাদ তাঁর না থাকলেও হিন্দু নামে আর একটি সম্প্রদায়ের ভালোর জন্য তাঁর যে

মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা প্রতিভাবান হিসাবে সেটি তাঁর একটি অপরাধ। ....বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাছে একজন জ্ঞানব্রতী সাহিত্যিক যাঁদের কাছে মানুষ কামনা করে এবং পায় স্বজন বাৎসল্যের চাইতে উঁচুদরের জিনিস—তার নাম মানবতা। হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম সাহিত্যে যতই থাকুক তাঁর সত্যকার প্রতিপাদ্য হিন্দুত্ব নয়, মানবতা—একথা স্পষ্ট করে বোঝা যায়, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথা ভাবলে।

"সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তিন মহাপুরুষকে পৃথিবীর সাম্য-অবতার বলেছেন (১) বুদ্ধদেব, (২) যীশুখৃষ্ট, (৩) রুশো। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যন্ত্রণাকাতর বোধ করেছেন এই কথা ভেবে:

দুঃখের বিষয়, যে মহাপুরুষ আরবের মরুকান্তার ধ্বনিত করিয়া জলদগাম্ভীর রবে ঘোষণা করিয়াছিলেন "আন্‌নাসু সওয়াসিয়াহ" সকল মানুষ সমান; "আল ইনসানু আখুল্ ইন্‌সানি হাব্বা আম্ কারিহা" —ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক সকল অবস্থাতেই মানুষ মানুষের ভাই; "লায়ুউমেনু আহাদুকুম্ হাত্তা য়ুহিব্বুলি আখি হি মা য়ুহিব্বুলি নাফসিহি" যে পর্য্যন্ত কেহ ভাইয়ের জন্য তাহা না ভালবাসিবে, যাহা সে নিজের জন্য ভালবাসে, সে পর্য্যন্ত সে ধর্মবিশ্বাসী (মুমিন) হইবে না—তাঁহার উদার উদাত্ত বাণী বঙ্কিমের কণ্ঠে পৌঁছে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন ও ধর্ম লোপ পেয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা যে জালে ভারতবর্ষকে জড়িয়েছিলেন, নিজেরাও সেই জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শহীদুল্লাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সামাজিক দুর্গতি সম্পর্কে বঙ্কিমের এই নিদান হরিজন আন্দোলনের সুলগ্নে অনুধাবন করা কর্তব্য। জমিদার ও রায়তের বৈষম্য দেখে বঙ্কিম বেদনাক্লিষ্ট হয়েছেন। ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন সমস্যা 'বিড়াল' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। বাংলার অর্ধেক অধিবাসী স্ত্রী জাতি কিন্তু তাহাদের উপকারার্থে কেউ নেই। বঙ্কিম ভাবনার এই সব রচনাত্মক ব্যঞ্জনা শহীদুল্লাহ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তিনি স্পষ্টোক্তি করেছেন, "পরাণ মন্ডল ও রামা কৈবর্তের জন্য বঙ্কিমের যতটুকু দরদ, হাসিম শেখের জন্যও ততটুকু। এখানে কোন হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির দিকে শহীদুল্লাহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বঙ্কিম লিখেছিলেন,

সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্বভুতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব, সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের

> কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না।

এই অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট তাৎপর্য শহীদুল্লাহ্ আমাদের অনুধাবণ করতে বলেছেন: "যে দিন হিন্দু বঙ্কিমের এই বৈষ্ণবের মত গ্রহণ করিবে, সেদিন হিন্দু সমস্যা থাকিবে না। সে শুভদিন কবে আসিবে!"

কাজী আবদুল ওদুদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এই দুই মুক্তমনা মনীষীর বঙ্কিমচর্চা এখানে পরিবেশন করলাম বিশেষ উদ্দেশ্যে। বঙ্কিম প্রতিভার সদর্থক ব্যাপ্তি ও গভীরতা দু'জনেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু রেজাউল করীমের বঙ্কিমচর্চার পটভূমি ছিল ভিন্ন মাত্রায় প্রসারিত। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মোহবন্ধন থেকে বুদ্ধির মুক্তি, এটাই ছিল রেজাউল করীমের স্বধর্ম, তাঁর স্বরাজ অভিসারের সুখস্বপ্ন। স্বদেশ, স্বরাজ, স্বধর্ম সমার্থক। এটাই ছিল রেজাউল করীমের জীবন বীক্ষার, সাহিত্য সাধনার ও বঙ্কিমচর্চার নিষ্কর্ষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ধর্মসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ

মুখবন্ধ

১৯৮৮ সালের ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ ঢাকায় অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। সেই সাক্ষাৎকারে বিবৃত অধ্যাপক মাহমুদের একটি প্রদীপ্ত উক্তি এই প্রবন্ধের শুরুতেই স্মরণ করছি। অধ্যাপক মাহমুদ বলেছিলেন:[১]

> পূর্ণেন্দু মজুমদার আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ওঁর কাছে পড়েই ইতিহাসের চেতনাটা এসেছিল আমার। এরকম সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধি, স্নেহশীল লোক খুব কমই দেখেছি। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি আমাদের পড়াতেন। রেণেসাঁর ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। যে বইগুলি পড়িয়েছিলেন আমার এখনও তা স্মরণে আছে। ১৯২৭/২৮ সালের দিকে ইমনসিপেশন অব ইনটেলেক্ট কথাটা আমাকে খুব নাড়া দেয়। ফ্রীডম ফ্রম দ্য সার্কেলস অব স্ক্রিপচারস, ফ্রীডম ফ্রম দ্য সার্কেলস অব প্রিস্টহুড এবং ফ্রীডম ফ্রম দ্য সার্কেলস অব এ্যারিস্টটল এই তিনটি ফ্রীডমের মানে তিনি আমাদের বুঝিয়েছিলেন। উত্তর জীবনে এই তিনটি ব্যাপার আমি মনে গেঁথে নিয়েছিলাম।

অধ্যাপক মাহমুদের মতো অধ্যাপক রেজাউল করীমও জাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের সমস্যা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই প্রবন্ধে আমি আলোচ্য বিষয়ে রেজাউল করীমের মতামত সংক্ষেপে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

১৯৯১ সালে *দেশ* পত্রিকার পক্ষ থেকে আবুল বাশার নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন রেজাউল করীমের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারে রেজাউল করীম তাঁকে জানান,[২]

ইংরেজ আসার পর সব কিছু তারা ভাঙতে চাইলে। নানারকম কৌশল নিয়ে ভাঙতে লাগল। এতো এক কথায় বলা যায় না। তাদের 'পলিসি' ই ছিল 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'। ভাঙো। যেটা তারা পেয়েছিল রোম থেকে।

সেপারেট করো, আলাদা করে দাও, হিন্দুর জন্য হিন্দু ক্যান্ডিডেট, মুসলমানের জন্য মুসলিম কান্ডিডেট, ইংরেজ চাইত। আলাদা করে করে, আলাদা করে করে, সেপারেট ইলেকশন করলেই হিন্দুর কাছে মুসলমান যাবে না, মুসলমানের কাছে হিন্দু যাবে না—এই ভাবে না গিয়ে গিয়ে, না গিয়ে গিয়ে সব আলাদা হয়ে যাবে—তাই তো হয়েছিল। এই ভাবে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী মুসলমান গোষ্ঠী ১৯৩১-৩২ সাল থেকেই পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার রেজাউল করীম ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা, কুমিল্লার চৌধুরি আশ্রাফুদ্দিন আমেদ, বর্ধমানের আবুল হায়াৎ এবং কম্যুনিস্টপারটির মুজাফফর আমেদ এবং আবদুল রসুল। আবুল মনসুর আহমেদ, সামসুদ্দিন আহমেদ, নৌশের আলি, হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর কবীর ও অন্যান্য অনেকেই ছিলেন তাঁদের সুযোগ্য সহযাত্রী।[৩] তাঁদের অটল প্রত্যয় ছিল যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সৃজ্যমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টির পথে প্রতিবন্ধক।

রেজাউল করীম লিখিত *For India and Islam* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসম্ভার।[৪] এই সব প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর সুদৃঢ় মতাদর্শ। এখানে তাঁর মতাদর্শের মূল সূত্রগুলি উল্লেখ করছি:

১. উক্ত গ্রন্থের মূল সুর হিসাবে রেজাউল করীম গোলটেবিল বৈঠকে মওলানা মহম্মদ আলির ভাষণের একটি অতি পরিচিত বাক্য উৎকলন করেছেন। মহম্মদ আলি বলেছিলেন, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রশ্নে তিনি প্রথমত ভারতীয়, দ্বিতীয়ত ভারতীয় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় এবং ভারতীয় ছাড়া তিনি অন্য কিছু নন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রেজাউল করীমের বীজমন্ত্র।

২. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন রেজাউল করীম। তাঁর মতে, পৃথক ব্যবস্থার ফলে বিশ্বের কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের আদৌ উন্নতি ঘটেনি। বরঞ্চ এর ফলে বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ রুদ্ধ হয়। সংরক্ষণের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। সংরক্ষণনীতি কৃপা নয়, অনুকম্পা নয়। আফিমের নেশার মতো তা মানুষকে বিবশ করে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

৩. সাম্প্রদায়িকতা খারাপ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতা খুবই খারাপ। হিন্দুবিরোধী মুসলমান এবং মুসলমানবিরোধী হিন্দুকে সহ্য করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী প্রতিক্রিয়াশীল মানুষদের এতটুকু সহ্য করা সম্ভব নয়।

৪. রেজাউল করীম মনে করতেন, অতি-রাষ্ট্রিক দেশপ্রেম (extra-territorial patriotism) মধ্যযুগের ধারণা। এটি অবাস্তব এবং মানবসমাজের পক্ষে হানিকর। ইসলামি ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের ধারণাকেও তিনি 'মিথ' মনে করতেন। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র ফেডারেশন গঠনের হয়ত সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা হাস্যকর ও নিরর্থক। তাঁর মতে, রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক মন্দার স্রোতের মুখে ধর্মের ভূমিকা একান্তই অকেজো। রেজাউল করীম আশা প্রকাশ করেছেন পূর্ণ, অখন্ড, অবিভাজ্য ভারতীয় জাতি গঠিত হবে ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান ও নানা সম্প্রদায়ের মিলিত সাধনায়। এই জাতির আনুগত্য থাকবে বিশ্বের একটিমাত্র দেশের প্রতি। সেই দেশ হল তাদের সকলের মাতৃভূমি অর্থাৎ ভারতবর্ষ।

৫. রেজাউল করীম মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন দেশপ্রেম ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অ-মুসলমান ও মুসলমান একত্রে মিলেমিশে একটি সুসংবদ্ধ জাতি গঠন করবে, স্বয়ং হজরত মহম্মদ এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। পয়গম্বর ইহুদিদের দিয়েছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি, খ্রিস্টানদের দিয়েছিলেন নানা অধিকারের সনদ এবং জরথুস্ত্রীয়দের স্বাধীনতার সনদ। এইসব সনদ ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে নিহিত আছে ইসলামের সারকথা। রেজাউল করীমের মতে, হজরত মহম্মদ নির্দেশিত ইসলাম ধর্মের মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ধর্মসাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব। পয়গম্বর এইসব নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছিলেন আশু প্রয়োজন সিদ্ধির কৌশল হিসাবে নয়, সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় নয়। উদার মানবতাবোধ এবং অন্য সম্প্রদায়ের অনুভূতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা ও ভালোবাসাই ছিল হজরত মহম্মদের প্রেরণার মূল উৎস। রেজাউল করীম আশা প্রকাশ করেছেন: পয়গম্বরের এই আদর্শই হোক আমাদের পথপ্রদর্শক। বিবদমান ধর্ম ও মতবাদের মধ্য থেকেই আমরা গড়ে তুলব এক সুসংহত জাতি। যেদিন আমরা তা গড়ে তুলতে পারব, সেদিনই হবে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত বিজয়।[৫] হিন্দুসমাজের অনুন্নত শ্রেণির

মানুষের দুর্দশার প্রতি তিনি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনুন্নত শ্রেণির স্বার্থ ইসলামের স্বার্থ। অনুন্নত শ্রেণির উত্থান বাস্তবে ইসলামের উত্থান।

৬. মুসলিম লিগের চৌদ্দ-দফা দাবি তিনি অগ্রাহ্য করতে বলেন মুসলিম সমাজকে। এসব দাবি গৃহীত হলেও মিলবে না মুসলমান সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা। পাওয়া যাবে না দেশব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দার গ্রাস থেকে অব্যাহতি। তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে না। মিলবে না সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের সুযোগ। অবক্ষয় ও অবনতি থেকে পরিত্রাণ মিলবে না নিষ্প্রাণ মুসলমান সমাজের চৌদ্দ-দফা দাবির মাধ্যমে।

দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থই একমাত্র স্বার্থ। মুসলমান সমাজের বিশেষ কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। দেশ স্বাধীন হলে এবং স্বাধীনতার আশীর্বাদ মুসলমান সমাজের উপর বর্ষিত হলে চৌদ্দ-দফায় তালিকাভুক্ত সুযোগ-সুবিধা ম্লান মনে হবে। ভারতীয় মুসলমান স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী নয়। তারা অনাবাসী অনিকেত যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত নন। পরাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে তারা নিষ্ক্রীয় দর্শক নন। ভারতীয় সভ্যতার অম্লান গৌরব ও মহিমার তারা অংশীদার। ভারতের অভ্যুদয়ে তাদের উত্থান এবং ভারতের পতনে তাদের পতন। সুতরাং সমগ্র ভারতের স্বার্থই ভারতীয় মুসলমান সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থ।

একটি উদাহরণ তিনি আমাদের গোচরে এনেছেন। হিজ হাইনেস আগা খাঁ *ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট করপোরেশন* খুলেছেন এবং মুসলিম সম্মেলনে ব্রিটিশভক্ত মুসলমানদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি একাজ করেছেন লাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের স্বার্থে। ভারতের দরিদ্র মুসলমান চাষিদের স্বার্থবিরোধী ছিল এই পদক্ষেপ। আগা খাঁর মতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের তাতে কিছু এসে যায় না।

৭. অর্থের মতোই ধর্মও সজ্জন মানুষের কাছে কল্যানময় আর্শীবাদ। কিন্তু লোভী, স্বার্থান্ধ, মৌলবাদী মানুষের কাছে ধর্ম হল অভিশাপ। শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের পথে অন্তরায়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে মানুষ হবে আরও আধ্যাত্মিক, কিন্তু কূটনীতিবিদ নন। আরও সুসমঞ্জস, সত্যপ্রিয় এবং সৎ। তিনি হবেন না সুযোগসন্ধানী এবং স্বার্থমগ্ন। তিনি রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দেখবেন। কূটনীতি, দ্বিচারিতা এবং পাটোয়ারি বুদ্ধি ধর্মসাধনার পথে অন্তরায়।

যদিও তাদের চরিত্রে ভিন্নমুখী ঝোঁক ও প্রবণতা দেখা যায়, তবু যৌথ পরিবারে অনেক ভাই একত্রে মিলেমিশে থাকে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ, একত্রে বসবাস করতে পারে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণে পার্থক্য থাকলেও দেশের জন্য সততহিতসাধনায় তারা সমবেতভাবে ব্রতী হতে পারে। ধর্মের প্রাঙ্গণ থেকে রাজনীতিকে পৃথক করে দেখা বলতে রেজাউল করীম একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

পাকিস্তান প্রস্তাবের অসারতা

জাতিগঠনের ক্ষেত্রে রেজাউল করীম সদা স্মরণ করেছেন যৌথ পরিবারের পরম্পরা। তাঁর স্থির প্রত্যয় হল, যৌথ পরিবারের মতো ভারতবাসী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাশাপাশি বাস করবে সুখে-দুঃখে সততহিতকামনায়, সততহিতসাধনায়। তাঁর বিচারে এটা নিছক তত্ত্বকথা নয়, এটা হল উপলব্ধিগম্য অক্ষয় আদর্শ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতের ভৌগোলিক অখন্ডতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি। শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক সংস্থায় আসন সংরক্ষণ এবং নির্দিষ্ট হারে চাকরির প্রতিশ্রুতি তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তারা একথা বোঝেননি যে আসন ও চাকরি সংরক্ষণের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন যোগ নেই।

পাঞ্জাবের রহমত আলি সর্বপ্রথমে ভারত-ব্যবচ্ছেদের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীর, এই কয়েকটি অঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন।[৮] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে তিনি বিভক্ত করতে চাননি।

রহমৎ আলির এই প্রস্তাবের সূত্র ধরে ডঃ লতিফ, স্যার সেকেন্দার প্রমুখ নেতাগন তাঁদের নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রচার করেন। মুসলিম লিগের লাহোর ও মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর *পাকিস্তানের বিচার* গ্রন্থে রেজাউল করীম লিখেছেন:[৯]

> ভবিষ্যতে কোন দিন পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করিবে কি না বলিতে পারি না। ইহা গৃহীত হউক আর না হউক, ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অসুবিধাগুলি কোন মতেই অবহেলা করা যায় না। ...যে ভেদনীতি এই কয়েকযুগ হইতে নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহা তাহারই চরম পরিণতি।

নব্য আল্-রেরুণী রেজাউল করীম

উক্ত গ্রন্থের শুরুতেই শিরোণাম পৃষ্ঠায় রেজাউল করীম উৎকলন করেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি:

> Pakistan is against the spirit of Islam. It cannot be said that one part of a country where the Muslims happen to be in a majority is Pak (pure) and other part where they are in minority is Napak (Impure).

সৈয়দ আবদুল লতিফ প্রচার করেছিলেন যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন রয়েছে তার মূল কথা হল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রভেদ। সুতরাং সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে দেশ বিভক্ত হলেই ধর্মসাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করতে হবে হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত, খ্রিস্টান ভারত, শিখ ভারত ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত খন্ডাকারে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ভারতকে বিভক্ত করতে হবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য চারটি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এগারোটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে (cultural Zones)। তাঁর মতে ধর্ম এবং সংস্কৃতি অভিন্ন।

রেজাউল করীম প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন আবদুল লতিফের প্রস্তাব সম্পর্কে। তিনি স্পস্টোক্তি করেছিলেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব হল মূল সমস্যা। পরাধীনতার যন্ত্রণাই ভারতবাসীকে বেঁধেছে একসূত্রে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধক চেতনা গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট বিভেদের প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে দেশাত্মবোধক চেতনাকে আরো জাগ্রত করতে হবে। সাইমন কমিশনসহ বিভিন্ন ব্রিটিশ কমিশন সমস্বরে ঘোষণা করেছে যে, ভারতে মিলন সেতুর চেয়ে বিভেদের প্রাচীরই অধিক দৃঢ়। একারণে ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন আদৌ সম্ভব নয়। দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনগণ এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। রেজাউল করীম বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুদূর অতীত থেকেই একটা 'কমন কালচার' বা 'কমন হেরিটেজ' গড়ে উঠেছে।[৮] সাম্প্রদায়িক বা সাংস্কৃতিক বিভেদকে গুরুত্ব না দিয়ে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে সেগুলিকেই রচনাত্মক দৃষ্টিতে প্রাধান্য দিতে হবে। কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতি শব্দটা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। এর নানা অর্থ আছে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। রাজনৈতিক নেতারা শব্দটি ব্যবহার করেন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি সংস্কৃতি সমার্থক নয়। ধর্মের অনুশাসন অনড়, অটল। কিন্তু সংস্কৃতির রূপান্তর আছে। অতীতের সংস্কৃতি থেকে বর্তমানের সংস্কৃতি ভিন্নরূপে অভিব্যক্ত। পরিবর্তন ঘটেছে নানাভাবে

অনেক কিছু গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে। আরবে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ধর্ম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আরবি সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। মুঘল সংস্কৃতির প্রাণরস নানা দিক দিয়ে পুষ্ট করেছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। হিন্দু-মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তা নিয়ে গর্বিত।

সৈয়দ আহমেদের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে লঘু করে দেখা হয়েছে। একারণে রেজাউল করীম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একথা সত্য সৈয়দ আহমদ ছিলেন ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরাগী এবং কংগ্রেস-বিরোধী। কিন্তু রেজাউল করীম তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, কারণ ঐক্যবদ্ধ অবিভক্ত জাতি হিসাবে ভারতবাসী গড়ে উঠুক, এই স্বপ্ন সৈয়দ আহমেদ দেখেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ও ঐক্যের তিনি একনিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি সম্প্রদায়কে তিনি দেশমাতার দুটি চক্ষু বলে অভিহিত করেছিলেন। একই পরিবারভুক্ত ভ্রাতা হিসাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব তিনি কামনা করেছেন। এই কামনা ছিল তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাসপুরে এক স্মরণীয় ভাষণে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা অনুবাদে এই ভাষণের সারাংশ এখানে উৎকলন করছি:

> হিন্দু মুসলমান ভাইগণ! আপনারা কি একই দেশে বাস করেন না? আপনাদের দেহ কি দাহ ও কবরস্থ হয় না একই মাটিতে? ...মনে রাখবেন, হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র ধর্মীয় পার্থক্য বোঝাবার জন্য। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, এই দেশে যারাই বাস করেন, তারা সবাই একই জাতিভুক্ত (জাতি এখানে nation অর্থে)। ধর্ম বিশ্বাসকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দেব না। একই দেশের অধিবাসী, একই সরকারের শাসনাধীন, একই উৎস থেকে উভয় সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি উৎসারিত এবং একইভাবে উভয় সম্প্রদাযের মানুষ দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় কাতর। উভয় জাতিকেই (race অর্থে) আমি হিন্দু নামে অভিহিত করতে চাই, কারণ উভয়েই হিন্দুস্তানের অধিবাসী।

সৈয়দ আহমেদের জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রেজাউল করীম। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান আমরা সবাই একই মাতৃভূমির সন্তান, জীবনবোধে ও জীবনাচরণে।

জাতীয়তাবাদের উপকরণ

জাতীয়তাবাদের উপকরণ রেজাউল করীম বিশ্লেষণ করেছেন পশ্চিমি সমাজবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে। স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)

বলেছেন, জাতিগঠনের পক্ষে সহায়ক উপাদান হল দেশবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সদিচ্ছা। এম. রেণান (M. Renan) জানিয়েছেন ভাষা নয়, জাতি (race) নয়, স্মৃতির পরম্পরা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগই জনগণকে (people অর্থে) রূপান্তরিত করে জাতি হিসাবে (nation অর্থে)। সেই স্মৃতির পরম্পরায় নিত্য প্রবাহিত হয় গৌরবের স্মৃতি, যন্ত্রণার স্মৃতি এবং আত্মবলিদানের স্মৃতি। তাছাড়া থাকবে উত্তরাধিকার হিসাবে ভাবী প্রজন্মের জন্য একই রাষ্ট্রে একসঙ্গে বসবাসের দুর্নিবার বাসনা। M. Duguil এর বক্তব্য হল, দেশ (territory অর্থে) এবং দেশবাসীর (population অর্থে) মধ্যে থাকবে অন্তরঙ্গ ও গভীর পরস্পর-নির্ভরতা (intimate and profound interdependence)। নির্ভরতা সম্পর্কে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কালপর্বে থাকবে জাগ্রত চেতনা (consciousness অর্থে)। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে, জনগণ (people) রূপান্তরিত হয় জাতি হিসাবে (nation অর্থে) জাতিসত্তাগত (ethnic) ও ভাষাগত (linguistic) কারণে নয়, যদিও জাতিসত্তা ও ভাষা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জাতি (race অর্থে) হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জাতি সংগঠন হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী। গারনারও বলেছেন, জাতিগঠনের (nation অর্থে) পক্ষে জাতিগত (race অর্থে) ও ভাষাগত ঐক্য অপরিহার্য নয়। আধুনিক যুগে ধর্মীয় বিভেদ জাতীয়তার পথে বাধা নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গ্রন্থি ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার চেয়ে বেশি শক্তিধর। পশ্চিমি সমাজবিজ্ঞানীদের জাতিচর্চা অনুধাবন করে রেজাউল করীম কয়েকটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ধর্মসহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহী ধর্মবোধ জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রধান স্তম্ভ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম জাতীয়তাবাদকে পরিপুষ্ট করে। স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকারের অন্যায় শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দৃপ্ত অভিজ্ঞতা, গাথায় ছন্দেসুরে বর্ণিত এবং সংগীতে তানলয়ে ধ্বনিত দেশের কালজয়ী মিশ্র পরম্পরা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অস্মিতা—এইসব হল মানবসমাজে পারস্পরিক সহানুভূতির উৎস এবং জাতীয়তাবাদের রচনাত্মক উপকরণ।

উপসংহার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকেই রেজাউল করীম ধর্মসম্প্রদায়িকতার মূল উৎসরূপে চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হননি।[৮] তাঁর স্বপ্ন ও সাধনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। দেশ বিভাগে তিনি যন্ত্রণাকাতর হয়েছেন। কিন্তু স্বপ্নভ্রষ্ট হননি,

আশাচ্যুত হননি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তিনি লিখেছেন:[১০]

> যে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে তাতে এসব ভেদ থাকবে না। দেশে কাহারও কোন সম্প্রদায়গত ও দলগত স্বার্থ স্বীকৃত হবে না। ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র অধিবাসী "ভারতীয়" ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত হবে না। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খৃষ্টান আর কেইবা তফশিলী, এসব বোধ আর কাহারও থাকবে না। প্রত্যেকটি অধিবাসী নিজেকে ভারতীয় বলেই বোধ করবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীন মর্যাদা তারা পাবে। নির্বাচনও হবে এই ভিত্তিতে, এই নীতিতে ধর্ম হবে লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মের নামে যেমন কেহ কোন সুবিধা পাবে না, তেমনি পাবে না কোনও অসুবিধা ধর্মের মতের জন্য। রাষ্ট্রানুগত্যই হবে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক ধর্ম। ...জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের সমগ্র অধিবাসীকে একত্র ক্ষেত্রে আনবার, একই আদর্শে মাতিয়ে দিবার এই যে নূতন প্রকৃতি, সেইটাই আনবে দেশে গণবিপ্লব। সেই বিপ্লবের ফলে দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যকার 'গণরাজ'।

১৯৪৮ সালে রেজাউল করীম ছিলেন উজ্জ্বল আশায় প্রদীপ্ত। ১৯৯৩ সালে তাঁর শেষ লেখার শিরোনাম তিনি দিলেন 'এই ভারতের স্বপ্ন কি দেখেছিলাম?' এই প্রবন্ধে আশাভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায় তিনি লিখলেন:[১১]

> বর্তমান ভারতের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে দেশের সামনে ধর্ম ছাড়া যেন আর কোনও সমস্যা বা করণীয় নেই। ধর্মীয় বিদ্বেষ, হানাহানি এবং তার ফলে রক্তক্ষয়—একে বন্ধ করাই যেন দেশের একমাত্র আশু কর্তব্য। অর্থাৎ একটা নেগেটিভ প্রচেষ্টা। আরও দুঃখের কথা সেই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠানের দরকার হচ্ছে। কেন, মানুষের হৃদয় কি ধর্মকে জায়গা দিতে পারছে না। যে-ধর্ম বা যে-প্রতিষ্ঠান মানুষের মূল্যবান প্রাণ নষ্ট করে, সেই ধর্ম বা সেই প্রতিষ্ঠানের কী মূল্য আছে?

এই প্রশ্নই হোক এই অধ্যায়ের শেষ প্রশ্ন এবং শেষ উত্তর। রেজাউল করীমের প্রতি অন্নদাশংকর রায়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য স্মরণ করি "করিম সাহেবের বাণী কালজয়ী হবে। মৈত্রীর সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না। সময়ে ফল ফলে"।[১২]

তথ্যসূত্র

১. সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত) **আব্দুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মারক গ্রন্থ** ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯, পৃ: ১০০।

২. আবুল বাশার, 'সমন্বয় চিন্তার চিরপথিক রেজাউল করীম' (রেজাউল

করীমের সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন আবুল বাশার), ***দেশ*** *২৪শে শ্রাবণ ১৩৯৮,* ১০ই আগস্ট ১৯৯১, ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, পৃ: ৪৫।

৩. A. Leonard Gordon. "Divided Bengal : Problems of Nationalism and Identidy in 1947 Partition" in M. Hasan (ed.) **India's Partition process, Strategy and Mobilisation.** Oxford University Press, Third Impression, 1997, p. 291.

৪. Rezaul Karim. **For India and Islam.** Calcutta : Chakravarty, Chatterjee and Co., 1937.

৫. এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন :

জহর সেন, **পূর্ণমানব রেজাউল করীম** কলকাতা : প্রভা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ: ২৮-৫৩।

৬. Rezaul Karim. **Pakistan Examined with the partition schemes of Dr. Latif, Sir Sikandar Hyat Khan and others.** Calcutta. The Book Company Ltd. 1941, p. 1-7.

৭. রেজাউল করীম, **পাকিস্তানের বিচার** কলকাতা : দি বুক কোম্পানি, ১৯৪২, ভুমিকা, সমগ্র ভূমিকা উৎকলিত হয়েছে:
জহর সেন, **রেজাউল করীম** (১৯০২ - ১৯৯৩) কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৭, পৃ: ৪৮ - ৪৯।

৮. আবুল বাশারকে রেজাউল করীম বলেছিলেন:

কমিউন্যাল হারমনির কথা লিখি, কোথায় কোথায় 'হারমনি' হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, সে কথা খবর করি। 'হারমনি' মানেই হল 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি।' 'হারমনি' মানে সব এক, কোথাও 'ডাইভারসিটি' নাই, তা নয়। 'ডাইভারসিটি' আছে, কিছু কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। 'হারমনি' মানে কিন্তু 'সিম্ফনি' নয়। কালচারের বিভিন্নতা আছে, আলাদা আলাদা জাত আছে। সব এক হয়ে যাবে তা নয়। পার্থক্য কিছু কিছু থাকবেই। থাকাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও ঐক্য থাকবে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য। এই হল কথা।

দেশ, ২৪শে শ্রাবণ ১৩৯৮, ১০ই আগস্ট ১৯৯১, ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, পৃ: ৪৪।

৯. এ বিষয়ে প্রখর বিশ্লেষণ করেছেন মুজিবর রহমান তাঁর লেখা "রেজাউল করীমের সমাজ চিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনা" শীর্ষক প্রবন্ধে (**জনমত** বিশেষ সংখ্যা ১৪০১ বঙ্গাব্দ পৃ: ১৪-১৯)। এই প্রবন্ধ পুনরায় প্রকাশিত

হয়েছে **জলসিড়ি** পত্রিকার রেজাউল করীম সংখ্যায় (জানুয়ারি - মার্চ, ২০০৩, পৃ: ৩৯-৪১)।

এই প্রসঙ্গে আবদুল ওয়াহাব মাহমুদের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে অনুধ্যেয়:

> আমার নিজের একটা ধারণা হয়েছিল যে, এই যে পাকিস্তান আন্দোলন এটা ইসলামিক ধর্মান্ধতার পরিচয় দেয়না। কিন্তু গভীর আর্থ-সামাজিক অনড় অনেকগুলি কারণ এর মধ্যে আছে। ইউরোপীয়ান ইতিহাস পড়ে আমি জেনেছি যে অনেক সময় গভীর আর্থ সামাজিক দাবীগুলি একটা বিশেষ সামাজিক পরিবেশে ধর্মের মুখোশ পরে। যেমন ইংলণ্ডে যে কতকগুলি পপুলার পিজেন্টস মুভমেন্ট হয়েছিল তাব মধ্যে আমরা একটা ধর্মীয় আভাস দেখতে পাই। সেই ভাবেই ১৪ শতকে জার্মানীর যে কতকগুলি খুব বড় বড় কৃষক আন্দোলন হয়েছিল যেগুলি বলা হয় বুংশ্রু, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিউডাল অত্যাচারে জর্জরিত সাধারণ লোক যখন জেগেছে তারা পুরণো দিনে ফিরে যেতে চায়। সেইযুগে ধর্মটা প্রবল ছিল। কাজে কাজেই ধর্ম একটা মুখোশ নেয়। আমার মনে হয় যে পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি ধর্মের একটা মুখোশ নিয়েছে।

সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত) **আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মারক গ্রন্থ**; পৃ: ১০১-০৩।

১০. রেজাউল করীম, "আমাদের রাষ্ট্র" **গণরাজ**, ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা ২৯জুন, ১৯৪৮, পৃ: ৬-৭।

১১. রেজাউল করীম, "এই ভারতের স্বপ্ন কি দেখেছিলাম?" **আজকাল**, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৩। প্রবন্ধটি উৎকলিত হয়েছে জহর সেন, **রেজাউল করীম** (১৯০২ - ১৯১৩) গ্রন্থে ১২৭ - ১২৯ পৃষ্ঠায়।

১২. রেজাউল করীম, **সংস্কৃতি সমন্বয় : কিছু ভাবনা**, কলকাতা : বুক ট্রাস্ট ১৯৮৩। অন্নদাশংকর রায় লিখিত ভূমিকার পৃষ্ঠা ২।

সপ্তম অধ্যায়

নব্য ইসলাম, আধুনিক তুরস্ক

১

শিরোনাম থেকেই একথা স্পষ্ট, এই অধ্যায় দুভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আলোচনা করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের উদারপন্থী ভাষ্য। দ্বিতীয় অংশে আছে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের আধুনিকীকরণ প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কালপর্বে মুক্তমনা মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ এই দুটি বিষয় নিয়েই বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁরা মনে করেছেন, এই প্রশ্নগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি জড়িত। বর্তমান যুগেও মূল সমস্যা হচ্ছে : ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বনাম যুক্তিশাসিত আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা। আননাসু সওয়াসিয়াহ (সকল মানুষ সমান), আল ইনসানু আখুল ইনসানি হাব্বা আম কারিহা (ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক সকল অবস্থায় মানুষ মানুষের ভাই), লায়ুউমেনু আহাদুকুম হাত্তা য়ুহিব্বুলি আখী হি মা য়ুহিব্বুলি নাফসিহি (যে পর্যন্ত কেহ ভাইয়ের জন্য তাহা না ভালবাসিবে যাহা সে নিজের জন্য ভালবাসে, সে পর্যন্ত সে ধর্মবিশ্বাসী (মুমিন) হইবে না)। "সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে মহম্মদ শহীদুল্লাহ ইসলাম ধর্মের সারমর্ম রূপে উপরে উদ্ধৃত অমৃতবাণী পরিকীর্তন করেছেন। মানবিক সুসম্পর্কের সেতুবন্ধনে হজরত মহম্মদের উপলব্ধিগম্য নীতিনির্দেশ কালজয়ী প্রভায় চিরভাস্বর।

বিনোবা ভাবে লিখিত কোর-আন-সার গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী (*বিনোবা রচনাবলী*, তৃতীয়খণ্ড, বিনোবা শতবার্ষিকী প্রকাশন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫)। এই গ্রন্থ থেকে সুরা বকরা ১৭৭, যা ধর্মের সার নামে অভিহিত, এখানে উৎকলন করছি।

"তোমরা তোমাদের মুখ পূর্বদিকে কর অথবা পশ্চিমদিকে কর—তাহার মধ্যে ধার্মিকতা নাই। বরং ধার্মিকতা এই যে মানুষ শ্রদ্ধা রাখিবে—ঈশ্বরের উপর, অন্তিম বিচার দিনের উপর, স্বর্গীয় দুতগণের উপর, ঈশ্বরীয় গ্রন্থের উপর ও প্রেরিত পুরুষগণের উপর; এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবশত ধনসম্পদ আত্মীয়স্বজনদিগকে, বঞ্চিতদিগকে, প্রবাসীদিগকে, যাচকদিগকে এবং ক্রীতদাসের দাসত্বমোচনের জন্য দান করিবে; তার নিত্যনিয়মিত প্রার্থনা করিবে ও দরিদ্রগণকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ (জাকাত) দিবে,

আর কোনো অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিবে এবং দুঃখ দুর্দশা, বিপদ ও সঙ্কটের সময়ে ধৈর্য ধারণ করিবে। তাহারাই সত্যপরায়ণ ও তাহারাই ধর্মভীরু।" (**বিনোরা রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৪)

সুরা বকরা ২৫৬ নম্বরের শিরোনাম হলো ধর্মসহিষ্ণুতা। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান নেই। বঙ্গানুবাদে এই সুরার মর্মবাণী শোনাচ্ছি।

"ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান নাই। এখন ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথ পৃথক ও স্পষ্ট হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সে নিশ্চয়ই সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিয়াছে, তাহা ছিন্ন হইবার নহে। ঈশ্বর সর্ব-শ্রোতা, সর্ব-জ্ঞাতা।" (তদেব, পৃঃ ১১৮)

কোর-আন সার গ্রন্থে সুরা নেছা ১৫২ নম্বরে বলা হয়েছে :

"কিন্তু যাহারা ইশ্বর ও তাঁর প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, ইশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান প্রেরণ করিবেন। ঈশ্বর ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (তদেব ১১৮)

ঈশ্বরের এসব নির্দেশ কি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল? তৎকালীন আরব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। মদিনা ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে তখন বসবাস করত ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমান, এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তাদের ভাবনাচিন্তা, রুচিবোধ এবং ধর্মসম্প্রদায়গত আনুগত্য ছিল পরস্পর বিপরীতধর্মী। হজরত মহম্মদ চেয়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক অর্থে একটি জাতি বা "কওম"-এ পরিণত করতে। মদিনার ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সম্মিলিত হয়ে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক দলিল রচনা করেছিল। সেখানে তাদের মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাধারণতন্ত্র। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে তারা ঘোষণা করেছিল :

১। ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মিলিতভাবে একটি উম্মত।

২। একত্রে তারা যুদ্ধ করবে দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য।

৩। সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্মের রীতিনীতি পালন করবে। কেউ অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

৪। মুসলমানগণ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সতত মিত্রের মতো আচরণ করবে। কোনো ভাবেই তাদের ক্ষতির সংকল্প পোষণ করবে না।

৫। আল্লার নামে এগুলি হল চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যারা এই সব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, তাদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হবে।

এই আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিকতা এখনও সমানভাবে অম্লান ও অক্ষুণ্ণ।

*১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে লিখিত একটি প্রবন্ধে, কাজী আবদুল ওদুদ এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি"। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর **শাশ্বত বঙ্গ** গ্রন্থে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। কাজী আবদুল ওদুদের যুক্তিবিন্যাস বর্তমান সংকটলগ্নে বিশেষভাবে অনুধ্যেয়:*

"ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) আবিষ্কারের পর খাদ্য বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন, খাদ্যে সূক্ষ্ম ভিটামিনের অভাব যদি হয় তবে স্থূল যত উপকরণই তাতে থাকুক সে সবের দ্বারা মানবদেহের প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না, তেমনি ধর্মের বিচিত্র বিধিবিধানের মূল যে সূক্ষ্ম মনুষ্যত্ব সাধন, অর্থাৎ জ্ঞান ও চরিত্রলাভ ও অশ্রান্ত শুভসাধনা, সেই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেলে ধর্মের বিধিবিধান পালনের দ্বারাও কোনো সত্যকার লাভ সম্ভবপর নয়, তা সে সব বিধিবিধান যত কষ্টসাধ্য হোক।" কোরআন বলেন:

> "তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে জ্ঞান পায়, সে মহাসম্পদ পায়, জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না।" (২:২৬৯)

> "আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একজন ক্রীতদাসের কথা ভাব, কোনো কিছুর উপরে তার কর্তৃত্ব নেই, আর ভাব অন্য একজনের কথা যাকে আমার তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট জীবিকা, তা থেকে সে খরচ করে চলে প্রকাশ্যে এবং গোপনে, এই দুইজন কি তুল্য মর্যাদার?" (১৬:৭৫)

> "ধর্মের এই যে মূল কথা মনুষ্যত্ব সাধনা, ব্যাপক ও গভীর মনুষ্যত্ব সাধনা এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে যে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের উপর ইমারত তোলার চেষ্টা করা হয় , মুসলমান সমাজের একালের শরীয়তপন্থীদের সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।" (**শাশ্বত বঙ্গ**, পৃ: ৩৩)

এই প্রবন্ধে উপসংহারে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন :

> "ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কী—আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থন করে। কিন্তু যিনি জানেন মুসলমান হওয়ার অর্থ আল্লাহর অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের অনুগত হওয়া, আর সেই জন্য জগতের বন্ধু হওয়া, তিনি নিঃসংশয়ে বুঝবেন—ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানবহিত।"

২

১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় রেজাউল করীম লিখিত **তুর্কি বীর কামাল পাশা**। কামাল আতাতুর্ক ছিলেন নব্য তুরস্কের জন্মদাতা। কামাল শুধুমাত্র তুরস্কের গৌরব নন, তিনি ছিলেন সমগ্র এশিয়ার গৌরব। পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে

এশিয়াকে রক্ষা করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, কামাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান মহাপুরুষ। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসুও আপন আদর্শের মডেল রূপে কামালকেই বরণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় রেজাউল করীম লিখেছেন,

> "ভারতের মত অর্দ্ধমৃত দেশের জন্য কামালেব ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষ চাই। এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য কামালের সুমহান আদর্শকে দেশবাসীর সামনে প্রকটিত করা যেন তাহাবা প্রেবণা পায়।"

এই অসামান্য গ্রন্থের প্রশস্তিরূপে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছিলেন,

> বিরাট মুসলিম জগতের উপর যে অমানিশা নেমে এসেছিল তার **উষার** কাকলি ফুটেছিল জামালুদ্দিন আফগানির কণ্ঠে, আর তার অরুণোদয় সূচিত হয়েছে কামাল আতাতুর্কের আর্বিভাবে।" (জহর সেন, **রেজাউল করীম**, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৭)

খ্রিস্টের জন্মের পর ত্রয়োদশ শতকে চিনের প্রাচীর থেকে শুরু করে গোটা মধ্য এশিয়া কবলিত হয় প্রখর খরায়। নানা উপজাতি ছড়িয়ে পড়ে নতুন ভূমির অন্বেষণে। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল ওসামানালি তুর্কি। তাদের নেতা ছিলেন সুলেমান শাহ। তাদের পতাকায় চিহ্নিত ছিল ধূসর বর্ণের নেকড়ে বাঘের মাথা। গোবি মরুভূমির প্রান্ত ছুঁয়ে প্রথমে পশ্চিমদিকে, তারপর উত্তরদিকে, অবশেষে দক্ষিণ দিক দিয়ে আর্মেনিয়া হয়ে এশিয়া মাইনরে এবং এইভাবে আধুনিক ইতিহাসে তারা পৌঁছে যায়।

সুলেমানের মৃত্যুর পর পিতাপুত্র পরম্পরায় দশ প্রজন্মের সুলতান সেখানে বাজত্ব করেছে। সাম্রাজ্যগুলি মৃতপ্রায়। সেলজুক তুর্কি ক্ষয়িষ্ণু, বাগদাদের আরব সাম্রাজ্য এবং খলিফা নিঃস্ব, বাইজানটাইন দুর্নীতিক্লিষ্ট। সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। আদ্রিয়াতিকের কূলে অবস্থিত আলবানিয়া থেকে পারস্যের সীমানা পর্যন্ত এবং ঈজিপ্ট থেকে ককেশাস পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছিল হাঙ্গেরি ও ক্রিমিয়া। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের স্তুতিতে তিনি গর্বিত। ভূমধ্যসাগরে তাঁর আধিপত্য সুনিশ্চিত। কনস্ট্যান্টিনোপল তাঁর করতলে। উত্তর আফ্রিকা মেনে নিয়েছে তাঁর বশ্যতা। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি করাঘাত করেছেন ভিয়েনার দ্বারে। গোটা খ্রিস্টান জগৎ আতঙ্কে ম্রিয়মাণ।

সুলেমান দি ম্যাগফিসেন্ট কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সেলিমের আমল থেকে শুরু হল দুর্নীতির অবাধ অনুপ্রবেশ। সেলিমের পর ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেছেন। ২৭ জন সুলতান। তাঁদের আমলে রাজপ্রাসাদের দায়িত্ব চলে আসে খোজা ও বারবনিতাদের হাতে। তুর্কি জাতির অমিত প্রাণশক্তি হল নিঃশেষিত। গ্রিস, সার্বিয়া

ও বুলগেরিয়ার মতো অধীনস্থ দেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

ইউরোপীয় খ্রিস্টান শক্তিগুলি লোভাতুর হয়ে উঠল। ক্রিমিয়া ও ককেশাস দখল করল রাশিয়া। কনস্টান্টিনোপল এবং দার্দনেলিসের পথ ধরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অঞ্চল তারা দাবি করল। সিরিয়া ও টিউনিস এল ফ্রান্সের দখলে। গ্রেট ব্রিটেন অধিকার করল ঈজিপ্ট ও সাইপ্রাস। সুলতান আবদুল হামিদের পক্ষে দাঁড়াল নবজাগ্রত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া। ১৮৭৭ সালে রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। বার্লিন কংগ্রেসের ডিজরেলির নেতৃত্বে অন্যান্য রুশ-বিরোধী ইউরোপীয় শক্তি সতর্ক-বার্তা ঘোষণা করে— অটোমান সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে হবে। এই ঘটনার ঠিক চার বছর পরে ইজিয়ান সাগরের তীরে সালোনিকা শহরে একটি তুর্কি সংসারে জন্মগ্রহণ করেন আলি হিজা এবং জুবেদার পুত্র মুস্তাফা কামাল পাশা।

কামাল পাশার জীবনকাহিনি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কীভাবে পরাক্রান্ত পশ্চিমি শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে তিনি তুরস্কের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা করেছিলেন, সেই বীরগাথাও এখানে অভিব্যক্ত হচ্ছে না। তুরস্কের আধুনিকীকরণের তিনিই ছিলেন প্রকৃত রূপকার। অতি সংক্ষেপে সেই প্রক্রিয়ার মমার্থ এখানে উল্লেখ করছি।

পারস্য, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, সিরিয়া এবং ইজিপ্টের মুসলমান সম্প্রদায় পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাচ্য জগতের বীরযোদ্ধা হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিল। কামাল পাশা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি ইসলামি জাতিসংঘে বিশ্বাসী নন, এমনকি তুর্কি জাতিসংঘ গঠনেও তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তুরস্ককে একটি ক্ষুদ্র, সুসংহত সুদৃঢ় উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। খিলাফততন্ত্র নয়, সুলতানি ব্যবস্থা নয়, তুরস্ক গড়ে উঠবে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে।

১৯১৯ সালে তুরস্কে গড়ে উঠেছিল আঞ্চলিক প্রতিরোধ সমিতি জাতীয়তাবাদী সংস্থা হিসাবে। এই সমিতিকে পিপলস পার্টি নামে অভিহিত করে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেন কামাল পাশা। রাজনীতি হবে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত। তাই কামাল পাশা তুরস্কের ইসলামি ধর্মনেতা শেখ-উল-ইসলামকে পদচ্যুত করলেন এবং বিতাড়িত করলেন তাঁকে তুরস্ক থেকে। খলিফাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে প্রতিবাদ জানান আগা খাঁ ও আমির আলী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইন পরিষদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তুরস্ক হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। ধর্মভিত্তিক আইনকানুন ও আদালত রদ করা হল। তার পরিবর্তে প্রচলিত হল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত আইনকানুন ও আদালত।

গ্রামে গ্রামে খেতখামার গড়ে তোলার কাজে তিনি ব্রতী হলেন। সমবায় সমিতি, কৃষি ব্যাংক, কৃষি ঋণ, বীজ বণ্টন, সেচ প্রকল্প, নতুন রাস্তা ও নতুন রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি ছিল তাঁর আধুনিকীকরণ কর্মসুচির অন্তর্গত। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় লাতিন লিপি প্রচলিত হয়। ফলে সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটে। তুরস্কের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি স্বয়ং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে শিখে নিলেন লাতিন লিপিতে তুর্কি ভাষার অনুশীলন। জটিল আরবি লিপির জন্য তুর্কি ভাষায় শিক্ষাদীক্ষা ছিল উচ্চবর্গীয় ইসলামি ধর্মগুরুদের মধ্যে সীমাবন্ধ। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি লাতিন লিপি প্রবর্তন করেন। নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অপরিসীম উৎসাহে দিনের পর দিন নতুন লিপি শিখিয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষকে।

সর্বাঙ্গীণ নারীমুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় সাধনায় নারী সমাজের অংশগ্রহণকে তিনি সর্বতোভাবে উৎসাহিত করেছেন। পর্দা বা অবরোধ প্রথার অবসান হয়েছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে নারীসমাজ ভোটাধিকার পেয়েছে। আইনজীবী, বিচারক, চিকিৎসক, সমস্ত পেশাতেই দক্ষতা দেখিয়েছে তুরস্কের নারী। পর্দার অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিল বলে তারা অগ্রণী হয়েছে নাচ গান চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকলা চর্চায়। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন বা মূর্তি নির্মাণ তুরস্কে নিষিদ্ধ ছিল চারশ বছর ধরে। কামাল পাশার নির্দেশে প্রত্যাহার করা হয় এই নিষেধাজ্ঞা। পশ্চিমি সংগীত ও নৃত্যকলা শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান।

ইকবাল তাঁর *Six Lectures on the Religious Thought in Islam* গ্রন্থে জানিয়েছেন তুরস্কের সংস্কার চেষ্টায় তিনি আনন্দিত। ইকবালের ইংরেজি ভাষায় বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। উপসংহারে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

> প্রকৃত কথা এই যে, ইসলাম অবলম্বী জাতিদের মধ্যে কেবল তুর্কিই বিশ্বাসপরায়ণতার সুখনিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগ্রতচিত্ত হয়েছে। কেবল সে-ই তার বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে, মাত্র সে-ই ভাবজগৎ থেকে বাস্তব জগতে পদার্পণ করেছে যার অর্থ মানস ও নৈতিক ক্ষেত্রে এক তীব্র সংগ্রাম। বোধহয় ইংরেজ মনীষী হব্‌স্ এই সুক্ষ্ম মন্তব্যটি করেছেন—
>
> "একই রকমের চিন্তা ও অনুভূতির অনুবৃত্তির অর্থ চিন্তা ও অনুভূতিবিহীনতা। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশের এই দশা। যান্ত্রিক ভাবে তাঁরা প্রাচীন সম্পদের অনুবর্তন করছেন, কিন্তু তুর্কি রত হয়েছে নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে।"
> **(শাশ্বত বঙ্গ পৃ: ২৩০)**

অষ্টম অধ্যায়
ধর্মনিরপেক্ষতার পরম্পরা

জাতীয়তাবাদী ও সমন্বয়বাদীরূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন রেজাউল করীম তাঁর লেখা নানা প্রবন্ধে ও ভাষণে। স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। "এই ভারতের স্বপ্ন কি দেখেছিলাম?'—এই শিরোনামে রেজাউল করীমের শেষ লেখা প্রকাশিত হয় **আজকাল** পত্রিকায় ১৯৯৩ সালের ১৮ নভেম্বর তারিখে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> আরও দুঃখের কথা সেই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠানের দরকার হচ্ছে। কেন, মানুষের হৃদয় কি ধর্মকে জায়গা দিতে পারছে না? যে-ধর্ম বা যে-প্রতিষ্ঠান মানুষের মূল্যবান প্রাণ নষ্ট করে, সেই ধর্ম বা সেই প্রতিষ্ঠানের কী মূল্য আছে? মানুষের চিন্তাধারার বিবর্তন এইভাবে হওয়া উচিত,-নন-সেকুলার থেকে সেকুলার। ধর্ম-প্রধান সাহিত্য থেকে যেদিন মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা করে মানুষের জয়গান গাইল, সেই সাহিত্যকে আমরা বেশী মূল্য দিয়েছি। ভারতেও ধর্ম সম্পর্কে ভাবনার এই বিবর্তন ও এই পরিণতি হওয়া উচিত ছিল। আমরা এর জন্যই আন্দোলন করেছি, লেখালেখি করেছি। আমরা বলতে চেয়েছি রাষ্ট্রকেও ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৫ নভেম্বর তিনি লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর পূর্বে ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি দেখে তিনি বিচলিত বোধ করেন। ওই প্রবন্ধে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন:

> কিন্তু আজ কী বাম, কী দক্ষিণ, সব জায়গাতেই আদর্শের ব্যাপারে আপস এসে প্রবেশ করেছে। আমি এবং দেশের আরও অসংখ্য মানুষ ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করেছি। আমি তার সবটুকু সেদিন যে দেখেছিলাম, তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুসলিম লিগকে কংগ্রেসের বিপরীত পন্থা বলে মনে করা হত। মনে করা হত মুসলিম লিগ সাম্প্রদায়িক দল আর কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল। অবশ্যই ঠিক ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম, কিছু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি

হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। এই অভ্যাস বা এই চিন্তাধারা আজও বাম-দক্ষিণ নির্বিশেষে, অনেকের মধ্যে অলক্ষ্যে বহমান এবং এটা খুব খারাপ লক্ষণ, দেশকে এ থেকে মুক্ত হতে হবে।

রেজাউল করীমের এই সব বক্তব্য অনুধাবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরম্পরার বিচারবিশ্লেষণ।

পশ্চিমি সেকুলারিজিম

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি প্রথম কবে এবং কীভাবে প্রচলিত হয়েছে, ঠিক জানি না। ইংরেজি শব্দ সেকুলারিজিম-এর বাংলায় ভাষান্তর হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সুপরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা এদেশে আদৌ শাসনতান্ত্রিক নয়। কারণ সংবিধানে এই নীতি যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। কীভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার অনুকূল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব, এটাই হল আসল সমস্যা। পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি পশ্চিমি যুক্তিবাদের সন্তান। পশ্চিমি সভ্যতায় নানা ধরণের সামাজিক উদ্যম পরিপুষ্ট হয়েছে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার প্রাণরসে। সেখানে রাষ্ট্রিক নীতিতে ও সামাজিক আচারআচরণে অমিত শক্তি সঞ্চার করেছে যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স* গ্রন্থের মতে সেকুলারিজিম শব্দটির প্রথম ও ব্যাপক প্রচার ঘটেছে George Jacob Holyoake-এর উদ্যোগে। ১৮৫১ সালে তিনিই এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, সোসাইটি গঠন করেন, এবং তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য The Reasoner শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেকুলারিজম-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, পরকালের জন্য কর্মকান্ডের চেয়ে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে ইহকালের কর্তব্যসমুদয়কে ("...precedence should be given to the duties of this life over those which pertain to another life.")। পরে Reasoner-এ তিনি তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন : আমরা ধর্মে অবিশ্বাসী নই। ("We are not infidels")। তাঁর মতে, এড়িয়ে যাবার অর্থ অস্বীকার করা নয়। এ পথে যাবার অর্থ অন্য পথে অন্য মানুষ যেতে থাকবে তা অস্বীকার করা নয়। স্থলপথে ভ্রমণ মানে জলপথকে অস্বীকার করা নয়। রসায়ণবিদ স্থাপত্যবিদ্যাকে এড়িয়ে যান, কিন্তু তা অস্বীকার করেন না ("To ignore is not to deny. To go one way is not to deny that there may be, to other persons, another way. To travel by land is not to deny the water. The chemist ignores architecture but he does not deny it.")। ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবস্থা নয়, মতাদর্শ নয়, চার্চ সংগঠন নয়। সুতরাং এর

কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই। পশ্চিমি সভ্যতায় যুক্তিবাদের উদ্ভবের সমসাময়িক হল ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ। ইউরোপে নবজাগরণের কালপর্বে মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল। এই মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ।

প্রাচীন যুগের গ্রিকরা কোন প্রয়োজন বোধ করেনি নিজেদের ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে পরিচয় দেবার। তাদের নির্দিষ্ট ধর্মমত ছিল না, প্রতিষ্ঠিত চার্চ সংগঠন ছিল না। কখনও কোন নিয়মবন্ধ পুরোহিত শ্রেণিও ছিল না। বিচার বিতর্ক ও মুক্তচিন্তার পথ রোধ করেনি ধর্ম। ধ্যান ধারণার বিচরণপথ ছিল অবাধ। শ্রদ্ধেয় পরম্পরা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে, গ্রাহ্য হয়েছে পরস্পর বিরোধী মতামত। গ্রিক সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত আইন, প্রথা ও নিয়মকানুনের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ভেদ করে, কালক্রমে রাষ্ট্রিক সীমানা পেরিয়ে।

মেকিয়াভেলি চেয়েছিলেন ধর্মের অভিভাবকত্ব থেকে রাজনীতির মুক্তি। হব্স্ এবং লকও ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে রাষ্ট্রনীতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রুশো ঘোষণা করেছিলেন মানুষের ভালোমন্দ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এর জন্য দায়ী নয় আদিম পাপ। ঈশ্বরও দায়ী নন। ব্যক্তিজীবনের ও সমাজের নৈতিক ভিত্তিভূমি কান্ট অন্বেষণ করেছেন মানুষের মধ্যেই, ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে নয়।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধন মাধ্যমে চার্চ ও রাষ্ট্রের কর্মের এলাকা সম্পূর্ণ পৃথক পরিসরে চিহ্নিত হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই পদক্ষেপ একটি মহৎ কৃতিত্ব হিসাবে অভিহিত। ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠিত চার্চ অর্থাৎ অ্যাংলিকান চার্চ পার্লামেন্টের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। তাই সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অভিব্যক্তি অপ্রতিহত। সম্রাট দ্বিতীয় জেমস ঘোষণা করেছিলেন : বিবেককে প্রতিহত করা উচিত নয়, ধর্মের ব্যাপারে মানুষের উপর বলপ্রয়োগও সঙ্গত নয় ("Conscience aught not to be constrained nor people forced on matters of religion.")।

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চিন্তানায়কদের ঐকান্তিক ব্রত ছিল ভারতে আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা। এই ব্রতকেই তারা ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এখানে গড়ে উঠবে শিল্পোন্নত সমাজ। গ্রাম ও শহরের সমাজকে সুস্পষ্ট ও সুনিবিড় সম্পর্কে অঙ্গাবন্ধ করবে জাতীয় বাজার। সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠবে প্রতিনিধিমূলক নানা প্রতিষ্ঠান। সেখানে সক্রিয় অংশ নেবে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হবে নানা

ধরণের রাজনৈতিক সংস্থা এবং এগুলির মাধ্যমে সঞ্চারিত হবে বিভিন্ন গণমুখী আন্দোলন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্রে কাজ করবে রাজনৈতিক সংস্থা ও গণমুখী আন্দোলন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল এই সুন্দর সমাজ গঠনের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু মনেপ্রাণে তাঁরা একথা বিশ্বাস করতেন যে, প্রাক-শিল্পোন্নত সমাজে ব্যক্তি ও জনসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ ও সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। এ কারণে তারা সমাজ ও সভ্যতার সুস্পষ্ট অঙ্গ হিসাবে লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্মের মূল্য অস্বীকার করতে পারেননি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী চিন্তানায়কগণ ভারতীয় পরিচিতি সন্ধান করেছেন সামাজিক বহুবচনের মধ্যে। সামাজিক বহুবচনের ঐক্যগ্রন্থিরূপে তাঁরা কল্পনা করেছেন জাতীয় রাষ্ট্র বা নেশন স্টেট নামে পরিচিত এক অবয়বের প্রতি আনুগত্য। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার—এই নীতিকে তাঁরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় চেতনার প্রাণপ্রদ শক্তিরূপে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, ইউরোপীয় বা পশ্চিমি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। কারণ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল সমাজ ও রাজনীতির প্রাঙ্গণ থেকে।

উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ প্রবাহিত হয়েছে কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারায়। অন্যতম প্রধান ধারা হল উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। এই মতাদর্শের প্রাথমিক সূত্র হল ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রিক নীতি নির্ধারণে ও সেই নীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা অপ্রাসঙ্গিক ও পরিহার্য। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্যের হেতু হল তার নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থবোধ। এই স্বার্থবোধও সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত সক্রিয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। ভারতের অর্থনীতি ছিল অনগ্রসর। শিল্প বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজনীয়তা তারা প্রচার করেছেন। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ধারার সাফল্য ছিল সীমাবদ্ধ। যেসব কথা, শব্দ ও ভাষায় চিন্তানায়কগণ তাঁদের বিশ্ববীক্ষা প্রচার করেছেন, সাধারণ মানুষের তা বোধগম্য ছিল না। তারা ছিলেন বিত্তবান ধনতান্ত্রিক শ্রেণির প্রতিভূ। সামাজিক বৈষম্যের কারণে অপমানে ও অর্থনৈতিক দুর্দশার যন্ত্রণায় ভারতের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল দুঃসহ। তাই ধনতান্ত্রিক শ্রেণির উদারনৈতিক ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তারা উৎসাহিত হয়নি।

সর্বোদয় আন্দোলন

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় সুস্পষ্ট ধারা হল সর্বোদয় আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এই ধারার প্রধান প্রবক্তা। সর্বোদয় নেতৃবর্গ জানতেন যে, জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ভারতের পরম্পরাগত ধর্মীয় মূলবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাঁরা কিন্তু বিশ্বাস করতেন, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের অনুগামীদের ধর্মীয় চেতনায় যদি রূপান্তর ঘটে, তাহলে হয়ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি। এ কারণেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে নৈতিক মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণ ও তীব্র করার সাধনাকেই তিনি ধর্মের মর্মকথারূপে প্রচার করেছিলেন। সর্বোদয় আন্দোলনে অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পরম্পরাগত যৌথ উদ্যোগের মিশ্রণ ঘটেছিল। সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ গান্ধীজনের দৃষ্টিতে নৈতিক বিচ্যুতি বা সামাজিক পরগাছাবৃত্তি বলে মনে হয়নি। কিন্তু কৃষি ও শিল্পের মালিক নিজেকে গণ্য করবেন সেই সম্পত্তির অছিরূপে, এটাই ছিল সর্বোদয় আন্দোলনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। অর্থাৎ সমগ্র সমাজের কল্যাণে শুধুমাত্র অছিরূপে কাজ করবেন ভূস্বামী ও শিল্পপতিবর্গ।

সর্বোদয় আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষ্য ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। পরম্পরাগত ধর্ম পরিত্যক্ত হয়নি। আবার আধুনিক যুগের চাহিদা মতো ধর্মীয় চেতনার রূপান্তরের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা ছিল। অছিতত্ত্বের মধ্যে ধনপতিশ্রেণি নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি ও ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করেছে বহুবাচনিক ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সুদৃঢ় ভিত্তি হতে পারে অবশ্যই সর্বোদয় আন্দোলন। এই বিশ্বাসের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, মহাত্মা গান্ধীর কালজয়ী চরিতামৃত ও অগ্নিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব মানুষের কাছে প্রেরণাপ্রদ ছিল। দ্বিতীয়ত, সর্বোদয় আন্দোলনে জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচয়, জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় জাগরণ ইত্যাদি ধারণা পরিবেশিত হয়েছে স্বরাজ, রামরাজ্য ইত্যাদি কিছু প্রতীক ও অতীত কাহিনির মাধ্যমে। তাঁদের সহজ ও রোচক ভাষার মধ্যে সাধারণ মানুষ আবিষ্কার করেছে পরম্পরাপুষ্ট সাধুসন্তদের আত্মত্যাগ, জনসেবা, সর্বজনীন ঈশ্বরের সাধনা, মানবমৈত্রী ও দুর্নিবার প্রেমের মহিমা। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসাবে গ্রামোন্নয়ন ও অছিতত্ত্বকে ধনবান শ্রেণি সমর্থন জানিয়েছে ও গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করেছে। কিন্তু সমগ্র সর্বোদয় আদর্শ, অছিতত্ত্ব ও গান্ধীজীর চারিত্রিক মহত্ব ধনবান শ্রেণিকে প্রভাবিত করেছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

রচনাত্মক ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের তৃতীয় ধারা হল রচনাত্মক ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন জওহরলাল নেহরু। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের কোন সৃজনশীল ভূমিকা থাকতে পারে না। অর্থাৎ ধর্ম হল একান্তভাবে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়বস্তু। শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ধারণা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেবে, এটাই কাম্য।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সর্বোদয় ভাবনা ও চরমপন্থী ধারণার মধ্যে এক ধরণের সৃজনাত্মক টানাপোড়েন চলছে। অবশ্যই এই দুটি ধারা যুগপৎ পাশাপাশি সক্রিয় থেকেছে ১৯৪৭ সালের কিছু আগে থেকেই। স্বাধীনতার পর এই দুই ধারার ব্যবধান কখনও কখনও অবলুপ্ত মনে হয়েছে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে এই দুই ধারার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বান্দ্বিক এবং বিতর্কমূলক। ভারতের সংবিধানের উদ্দেশিকায় ভারতকে এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক লোকতন্ত্ররূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা সংযোজিত হয় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ঈশ্বর-বিরোধিতা নয়। ঈশ্বর বিশ্বাসী, নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী, সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখা সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মাপকাঠিতে। এর মূল বক্তব্য হল রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে ঈশ্বর অপ্রাসঙ্গিক। একারণে ধর্মীয় কারণে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না। শুধুমাত্র বর্তমান জীবন ও সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে নৈতিক মানদন্ড ও আচরণ। বহুবচন হল ভারতীয় সংস্কৃতির সারকথা। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যক্ত করেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ পন্ডিতবর্গ এবং ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকমন্ডলী। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ধর্মাশ্রিত নয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিদ্বন্দ্বই হল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মূল ভিত্তি। বুর্জোয়া শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুরক্ষা ও প্রসারই হল রাষ্ট্রিক নীতির মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাদের রাজনীতি কখনও ধর্মসাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট, কখনও বা প্রয়োজনবোধে ধর্মনিরপেক্ষ। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য একমাত্র রক্ষাকবচ হল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের ভূমিকা হল একান্তই গৌন। কিন্তু একথাও সত্য প্রচলিত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার লালসায় অনেক বামপন্থী প্রার্থী নির্বাচনী কৌশলের অজুহাতে ধর্মসম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তার সুযোগও নিয়েছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

কালপর্বেও নানা রাজনৈতিক ধারায় ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কিছু টানাপোড়েন ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষেও তা দূর হয়নি।

সাম্প্রতিক চিত্র

১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও কার্যকর করা ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রনায়কদের অসামান্য কৃতিত্ব। বহুভাষাভাষী অঞ্চল, বহু ধর্মসম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং খন্ডস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে একটি সুসংহত জাতি রাষ্ট্রে বা ন্যাশন স্টেটে পরিণত করা সহজসাধ্য ছিল না। ভারতবর্ষে জাতি রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম ও এক রাষ্ট্র এই নীতি ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থান পায়নি। সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের এবং বঞ্চিত সামাজিক শ্রেণির অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় শাসনতন্ত্রের প্রণেতারা ও ব্যাখাতাগণ ছিলেন বদ্ধপরিকর। সমাজব্যবস্থার অপরিণত বিকাশের পটভূমিকায় সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগ ছিল অসামান্য দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। ১৯৫০ এর দশকেই কার্যকর হয়েছে সামন্ততন্ত্রের অবসানকল্পে জমিদারি উচ্ছেদ আইন, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ, পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদায় নারী লাভ করেছে সমঅধিকারের আইনগত স্বীকৃতি। এসবের ফলে প্রশস্ত হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র।

১৯৬০ এর দশকে উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট ধরা পড়ল। সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ স্তিমিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতাদ্বন্দ্বে তখনও চাবুক ও লাগাম ছিল জমিদারকুলের করায়ত্ত। কৃষি উৎপাদন কাঙিক্ষত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারেনি। শিল্প বিকাশের গতিও ছিল হতাশজনক। অর্থনীতি ছিল স্থানু। সর্বশ্রেণির মানুষ ছিল বিক্ষুব্ধ। জাতীয় কংগ্রেস ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষীণ তেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। ১৯৭০ এর দশকে অবশ্য কৃষি-উৎপাদন আশাতীত প্রাণশক্তি ফিরে পায়। ভারী শিল্প ও নানাবিধ আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি গ্রামাঞ্চলও শিল্প-সভ্যতার আস্বাদ পেয়েছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ যে সব সমস্যায় জর্জরিত, তার কারণ যথোচিত উন্নয়নের অভাব এবং অসম উন্নয়নের প্রভাব। সাধারণ মানুষ এখন রাজনীতি-সচেতন। প্রান্তিক সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ উন্নয়নে অংশ নিতে আগ্রহী, উন্নয়নের সুফলের অংশীদার হতে সচেষ্ট। সর্ববিধ আকাঙক্ষা গগনচুম্বী। নানা আন্দোলন, অসন্তোষ ও দ্বন্দ্বের

মধ্যে তা প্রতিফলিত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মঘাতী হানাহানির প্রকৃত কারণও কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত নয়। সম্পদ উৎপাদনে বিনিয়োগ এবং উৎপাদিত সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জন, রাজনৈতিক ক্ষমতা একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ ভোগের জন্য অতিলোলুপতা ও মত্ততা এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা, এসব কারণেই ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক আন্দোলন ও নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ। হয়ত মনে হতে পারে, এসব অতিপরিচিত সূত্র নির্দেশ করে আমি গভীর সমস্যার অতি সরলীকরণ করেছি। কিন্তু একথাও সত্য, জাতি রাষ্ট্রের কল্পনার মধ্যেই বিদ্বেষ জড়িয়ে আছে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদমুখর ছিলেন ঠিক এই কারণেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ হিসেবে হারিয়েছে তার সৃজনশীল কার্যকুশলতা। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ যান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণের মতো জাতীয়তাবাদের স্তবগানে নিত্যই মগ্ন। গণতান্ত্রিক চেতনা এখন প্রসারিত হয়েছে আঞ্চলিক তৃণমূল স্তরে, ক্ষেত্রীয় প্রাঙ্গনে। শুধুমাত্র সম্পদ বিনিয়োগ ও বন্টনের ক্ষেত্রেই নয়, আঞ্চলিক ও ক্ষেত্রীয় সংস্কৃতির যথাযোগ্য স্বীকৃতির প্রশ্নে মানুষ সচেতন হয়েছে প্রবলভাবে। প্রখর সংঘর্ষ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এখন তাই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই বলছি জাতি-রাষ্ট্র গঠন নয়, জাতীয় রাষ্ট্রের সুরক্ষা নয়। মতাদর্শ পালটাতে হবে। অবশ্যকর্তব্য হল সভ্যতা-সংরক্ষণ। মানবিক সভ্যতার প্রসার। মানবিক সভ্যতার মর্মবানী হল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি, আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।" ধর্মনিরপেক্ষতার পরম্পরা সুরক্ষিত থাকবে, শুধুমাত্র যদি সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো সদাচার, মানবতা ও সভ্যতামুখী হয়।

নবম অধ্যায়

গান্ধীপথ আধুনিক বিশ্বেও সতত সৃজ্যমান

আইন অমান্য আন্দোলন তখন পরিত্যক্ত হয়েছে। কাউন্সিল প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আর নেই। জাতীয় কংগ্রেস কি সরকারি দপ্তর গ্রহণে সম্মত হবে? এই প্রশ্ন তখন অমীমাংসিত। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন, নানা দ্বিধা, নানা দ্বন্দ্ব। তাহলে কি গান্ধীপথ ব্যর্থ হয়েছে? অনেক অগ্নিপরীক্ষার পর, তাহলে কি গান্ধীপথে সুফল মেলেনি?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেজাউল করীম তাঁর Has Gandhism failed? প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর *For India and Islam* গ্রন্থে (Chakravarty Chatterjee & Co. Ltd., 1937, pp 75-81)।

রেজাউল করীম জানাচ্ছেন, প্রায় ১২০ বছর পূর্বে ইউরোপেও প্রশ্ন উঠেছিল, ফরাসি বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছে? ওয়ার্টার্লুর প্রান্তরে নেপোলিয়ন তখন পর্যুদস্ত। মিত্রশক্তির বিজয়ী সেনাবাহিনী বীরদর্পে প্যারিসে প্রবেশ করেছে। বুরবোঁ রাজবংশ শূন্য সিংহাসন ফিরে পেয়েছে। অবসান ঘটেছে প্রজাতন্ত্রের। ধূলিসাৎ হয়েছে গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় আশা আকাঙক্ষা। তাই প্রশ্ন: ফরাসি বিপ্লব মৃত্যুহীন। ফরাসি বিপ্লব যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল, তা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে, স্পষ্টত এবং অস্পষ্টত, বর্তমান বিশ্বের সমস্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তেমনি গান্ধীপথও ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হতে পারে না। গান্ধীপথ তেজস্বী শক্তি, প্রাণদায়ী শক্তি, আত্মার পুষ্টিকর শক্তি। গান্ধীপথ চিরচঞ্চল ভাবতরঙ্গ যা সবকিছু অনুসন্ধান করবে, কোন কিছুই অপরীক্ষিত রাখবে না আপন কাঙিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য। একই অবয়বে গান্ধীপথ বিপ্লব ও বিবর্তন। গান্ধীপথ একত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজচিন্তা ও নীতিশাস্ত্র। যুগপৎ একই আধারে গান্ধীপথ বস্তুতন্ত্র এবং অধ্যাত্মবাদ। গান্ধীপথে সব কিছু আছে, সব কিছুকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত এমন কিছু আছে, যা এখনও সৃজ্যমান।

তাহলে কোন আদর্শ ও নীতির উপর গান্ধীপথ দাঁড়িয়ে আছে? কিভাবে তা সফলতা লাভ করেছে? রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক, সব রকমের বন্ধন

থেকে দেশের মুক্তি গান্ধীপথের কাম্য আদর্শ। রেজাউল করীম জানাচ্ছেন, দৃশ্যত এবং অদৃশ্যে, প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে ভারতবাসীর জীবনের সমস্ত প্রাঙ্গণ গান্ধীপথ প্রভাবিত করেছে, এখনও প্রভাবিত করছে এবং আগামী অনেক প্রজন্ম ধরে প্রভাবিত করবে। বীরত্ব ও সাহসিকতার মহান ভাবতরঙ্গের ধারক হল গান্ধীপথ। গান্ধীপথ নিজস্ব ইতিহাস রচনা করেছে। এই ইতিহাস ভাবী প্রজন্মের কাছে অভিনব। সানন্দে এবং সগর্বে ভাবী প্রজন্ম জানবে, পদানত মানুষের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এখানে, এই ভারতবর্ষে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বিশ্বের যে কোন পদ্ধতির চেয়ে অধিক নিশ্চিত, মহৎ ও পবিত্র। এখানে অস্ত্রের ঝঙ্কার শুনবে না, নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদও শুনবে না। এখানে যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ ও মানবিক পথে। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণই যা কিছু ছিল, তা ছিল বিপক্ষ দলের হাতে গান্ধীপথের নতুন পদ্ধতিকে নির্মূল করার জন্য।

প্রাক-গান্ধীযুগে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম চলেছিল। অসহায় দেশবাসীর প্রতি করুণা বর্ষণের জন্য শাসকশ্রেণির পদপ্রান্তে তা ছিল সৌখীন রাজনীতিবিদদের আবেদন অনুরোধ ও দরখাস্ত দানের ভীরু ও ক্ষীণ প্রচেষ্টা। অনুরোধ ও প্রার্থনায় যখন শাসকশ্রেণির হৃদয় গলেনি, তখন প্রাক-গান্ধী কালপর্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অতি সামান্য ক্ষমতা অর্জনেরও বিকল্প পথ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তাঁদের যা কিছু শুভকামনা, সব নিষ্ফল হয়ে যায় এই নীতিতে, যার মূল কথা হল "এই পর্যন্ত, এর বেশি নয়।"

ঠিক সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল অন্ধকারময় এবং হতাশাক্লিষ্ট। দেশের মানুষ ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন ও কাপুরুষ। জীবন ছিল মৃতপ্রায়, প্রাণহীন, ভাবহীন। মানুষ বিশ্বাস করতে পারেনি যে তারা মহৎ কিছু করতে সক্ষম। 'স্বরাজ', 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি', এসব নির্দোষ কথা মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে তারা সহস পায়নি। ঠিক এমন সময়ে আশা ও জীবনের, নব অভ্যুদয়ের ও মুক্তির নতুন বাণী তাদের সামনে স্পষ্ট রূপরেখায় রাখলেন এই শীর্ণদেহী মানুষটি। সহসা সমস্ত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ হয়ে উঠল। গোটা জাতি জেগে উঠল যুগযুগান্তের অবসাদ ও তামসিকতা থেকে।

রেজাউল করীম লিখেছেন, গান্ধীপথ ভারতবর্ষে জাতীয় মহত্ত্বের চেতনা সঞ্চার করেছে। প্রতি ভারতবাসীর মনে তাদের আপন শক্তি সম্পর্কে ভাবাবেগ জাগিয়েছে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে, অবহিত হয়েছে আদর্শের মহত্ত্ব সম্পর্কে, যে আদর্শের জন্য কোন আত্মত্যাগই অসম্মানজনক নয়। গান্ধীপথ

ভারতবাসীকে ভাবতে শিখিয়েছে, দেশের স্বাধীনতা অন্যের হাত থেকে প্রাপ্ত উপহার নয়। এটা ঈশ্বর-প্রেরিত নয়। স্বাধীনতা তৃতীয় পক্ষের দয়াদাক্ষিণ্য নয়। ব্যাক্তিগত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও মহত্ত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। অধোগতিতে নিমজ্জিত মানুষের মনে মহত্ত্ব, ঔদার্য ও পরম আত্মত্যাগ সঞ্চার করার জন্য তিনি সত্যাগ্রহের অভিনব পথনির্দেশ দিলেন। সত্যাগ্রহের যাদুদন্ডের স্পর্শে ঘুমন্ত দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সজাগ হয়ে উঠল। নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহের সক্রিয় উপলব্ধিই হল অসহযোগ। রেজাউল করীম এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "অন্যের হিতসাধন কর", একক নীতি হিসাবে এই নীতি পূর্ণ ও শুদ্ধ পদ্ধতি নয়। এই নীতির সঙ্গে আর একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তব নীতি যোগ করতে হবে। তা হল: "অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবে না, তোমার যাবতীয় শক্তি দিয়ে অন্যায় প্রতিরোধ কর।" এই দুই আদর্শের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে পরিপূর্ণ সদাচার নীতি। অসহযোগ পদ্ধতির মধ্যে এই দুই আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। রেজাউল করীমের মতে এটাই হল গান্ধীপথের মৌলিক নীতি (This is the fundamental principle of Gandhism...)।

কিন্তু অনেকেই বলবেন, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ। কারণ, এর ফলে স্বরাজ মেলেনি। এই যদি ব্যর্থতার নিদর্শন হয়, তাহলে আমরা পরাজয় স্বীকার করছি। কিন্তু এটা হল গভীর বিচার। গভীরভাবে তলিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, অসহযোগ আন্দোলন, কোনটাই ব্যর্থ নয়। সমগ্র জাতির জীবনে, জাতি গঠনে এবং জাতি রূপায়ণে এই দুই আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ভারতবর্ষের হতচেতন মানুষের মধ্যে গান্ধীপথে যে বিপুল অভ্যুদয় এবং যে প্রচন্ড বিদ্রোহ ঘটেছে, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এই গণঅভ্যুত্থান একাধিক অর্থে ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। বিদেশি শাসনে নিষ্পেষিত মানুষের কাছে গান্ধীপথ আশা ও জীবনের প্রবল প্রেরণার বাণী শুনিয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের মত্রো, গান্ধীপথও জনগণের শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবন নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু গান্ধীপথে এমন অতিরিক্ত কিছু আছে, রেজাউল করীম আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন, যা ফরাসি বিপ্লবে নেই। গান্ধীপথের প্রভাব কোমল, মহান এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিশুদ্ধ। অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এখানেই গান্ধীপথের পার্থক্য। গান্ধীপথ এমন বিদ্রোহ নয়, যার পরিণতি রাজহত্যা, গণহত্যা এবং লুণ্ঠন। গান্ধীপথ আকস্মিক ও গতিশীল বিদ্রোহ, কিন্তু ও বিপ্লব শান্তিপূর্ণ, অহিংস, রক্তপাতহীন, নিশ্চিত এবং অধিক ফলপ্রসূ।

লক্ষ লক্ষ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী দু দশক আগে ছিল যেন অসহায় নিষ্প্রাণ শব। এখন তারা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। মূক ঘৃণিত দলিত শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি ছিল

অবহেলিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও দাসত্বের বন্ধনে তাদের জীবন ছিল দুঃসহ ও নিরানন্দময়। অখন্ড মানবতায় উজ্জ্বল গান্ধীপথ তাদেরকে টেনে এনেছে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। এই সর্বতোমুখী গণআন্দোলন এখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও প্রবণতার সমৃদ্ধ হয়েছে। বলদর্পী শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার আন্দোলন, নারী মুক্তি আন্দোলন এবং এরকম আরও নানা আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গান্ধী আন্দোলন সঞ্জাত এবং গান্ধীপথ অনুসারী।

রেজাউল করীম লিখেছেন, গান্ধীপথে যা কিছু মেলে, সবই ভাল। এখানে মন্দের কোন স্থান নেই। এই অর্থে গান্ধীপথ ধর্মীয় ও নৈতিক বিপ্লবের রূপ নিয়েছে (Gandhism is one of those few movements which are productive of all good and no evil, and in thus Gandhism partakes of the nature of religious and ethical revolution of a country)।

সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, এ-সব হল গান্ধীপথের নানা দিগদর্শন। কিন্তু গান্ধীমার্গের সারমর্ম হচ্ছে উপলব্ধি। ব্যর্থতায় তা পর্যুদস্ত হয় না, সাফল্যে তা আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেয় না। নিহত হয় না নিপীড়নে, পরাজয়ে হয় না অবদমিত। গান্ধীপথের পথিক জয়পরাজয়ে সমভাবাপন্ন ও আসক্তিবর্জিত।

রেজাউল করীমের এই অমৃতঅনুসন্ধান প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন গান্ধীপথের মহিমা। কিন্তু তিনটি কালজয়ী, চিরন্তন, অনির্বাণ আলোকশিখার প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন: ১. যে কোন কালে, যে কোন স্থানে যে কোন পরিস্থিতিতে গান্ধীপথ সতত সৃজ্যমান, তাই উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। ২। গান্ধীপথ একই সঙ্গে বিপ্লব ও বিবর্তন। ৩. গান্ধীপথ যুগপৎ জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী। গান্ধীপথ তাই সর্বজনীন ও সর্বতোভদ্র।

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির মুখপত্র ছিল **গণরাজ** পত্রিকা। রেজাউল করীম ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। **গণরাজ** পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ বুধবার ১৩৫৫, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে। পত্রিকাটি প্রায় দু'বছর চলেছিল।

প্রথম সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন রেজাউল করীম "জয়তু গান্ধীজী" শিরোনামে। মানুষের স্বাভাবিক উপদেষ্টা, ভারতের সত্যকার প্রতিনিধি, প্রতিনিধিমূলক মহামানব ইত্যাদি নিগূঢ় অর্থময় অভিধায় তিনি গান্ধীবন্দনা করেছেন ওই প্রবন্ধে। ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট **গণরাজ** পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় "স্বাধীনতার বৎসর" শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গান্ধীবাদী রেজাউল করীম আশা প্রকাশ করেছেন: "রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে সাম্প্রদায়িকতা বিদায় গ্রহণ করিলে

অচিরে সমাজ ব্যবস্থার উপর তাহার প্রভাব পড়িবে এবং দেশ হইতে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।"

গান্ধীজীর তিরোধানের পর স্বাধীন ভারতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেজাউল করীম প্রতিনিয়ত স্মরণ করেছেন তাঁর সর্বকালের উপযোগী আদর্শ। গান্ধীপথ প্রসঙ্গে রেজাউল করীম লিখেছেন, নব্য ও প্রাচীন এই দুই সভ্যতার ধারা তাঁর মধ্যে এমন সুসমঞ্জসভাবে মিলিত হয়েছিল যে দেখতে অবাক হতে হয়। একদিকে অনুরক্ষণশীলতা আর অপরদিকে উগ্র প্রগতিশীলতা এই দুই চরম আদর্শের মধ্যে তিনি অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন" (**গণরাজ**, ১ বর্ষ, সংখ্যা, ১ ১৩৫৫, ইং ১৪ এপ্রিল ১৯৪৮, পৃ:১) । সুস্পষ্ট ভাষায় রেজাউল করীম জানিয়েছেন: "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া গান্ধীজী জাতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা রাজনৈতিক দান হইতেও সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। জাতি ছিল একটা প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত। তিনি সেই মৃত প্রায় জাতিকে মহতী নীতি ও উচ্চ আদর্শের দ্বারা নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন" (**গণরাজ**, শারদীয়া সংখ্যা, ২ অক্টোবর ১৯৪৮, পৃ: ৯)

গান্ধীজী রাজনীতিতে যোগ দিলেন কেন? এই প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি। রেজাউল করীম বিশ্লেষণ করেছেন গান্ধীজীর সাধনার মূলসূত্র। তিনি লিখেছেন:

> "তিনি পরিপূর্ণ মানুষ। মানুষের দেহের ও আত্মার কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহারই মূলসূত্র আবিষ্কারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। রাজনীতিতে যোগদানের কারণ সম্পর্কে তিনি বলিযাছেন : To see the individual and all-pervading spirit of Truth face to face, one must be able to love the meanest of creation oneself. And a man who aspires after that can not afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into politics. অর্থাৎ 'সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক সত্যকে মুখোমুখি দেখিতে হইলে নিজেরই মত নিকৃষ্টতম সৃষ্ট বস্তুকে ভালবাসিতে হইবে। যে মানুষ এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়, সে আপনাকে জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সত্যের প্রতি এই অকুণ্ঠ নিষ্ঠাই আমাকে রাজনীতিতে আর্কষণ করিয়াছে।' সত্য-প্রীতি গান্ধীজীর জীবনের মূল সূত্র। এই সত্য হইতে প্রেমের জন্ম। তিনি প্রেম ও ত্যাগের দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছেন। দেশে আনিয়াছেন স্বাধীনতা, জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মহৎ মর্য্যাদার উপর" (তদেব, পৃ: ১৩)।

গান্ধীপথের সার্থকতা খাদি আন্দোলনের সফলতার উপর নির্ভরশীল, রেজাউল করীম এ বিষয়ে আমাদের সজাগ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> "আমাদের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন পুর্নগঠন করিবার জন্য

আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। কুটীর শিল্প হইতেছে সেই পদ্ধতির সর্ব্ব কথা। উৎপাদন ব্যবস্থার নিস্কেন্দ্রীকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থার ভারসাম্য সংরক্ষণ এই দুইটি হইবে আমাদের গ্রাম্য শিল্প গঠনের প্রধান আদর্শ ও পথ নির্দেশক। আমাদের দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ইহা সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। ইহা শান্তি, প্রীতি ও অহিংসার সহায়ক। জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বমানবের কল্যাণের চিন্তা আজ বহুদিন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্প প্রধান দেশের মত ভারতবর্ষ যাহাতে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া না চলে তাহার ব্যবস্থা আজ হইতে করিতে হইবে। জগতে তথা ভারতে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রবর্তন। কুটীর শিল্প উৎপাদন ও বণ্টনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় যাহা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে না; সাম্রাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয় না; বিশ্ব মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে না, এই জন্য কুটীর শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রামই ভারতীয় সভ্যতার কর্ম্ম কেন্দ্র। গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো সুদৃঢ় না রাখিলে ভারতের কল্যাণ হইবে না। কিন্তু কুটির শিল্পের সমর্থনে দু'একটা ফাঁকা বুলি উচ্চারণ করিলে চলিবে না। এ জন্য চাই সুপরিকল্পিত প্ল্যান ও পরিকল্পনা গ্রাম্য শিল্প ও তাহার সুবিদিত বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির লোকের সহিত যে একটা নাড়ীর যোগ রহিয়াছে তাহাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। এই পথে আমাদের কোটী কোটী দেশবাসী স্বাবলম্বী হইবে। দেশ সত্যকারভাবে স্বাধীন হইবে এবং তাহারই ফলে দেশ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবে। দেশের নষ্ট শ্রী ও বিভববিত্ত ফিরিয়া আসিবে। সর্ব্বত্র শান্তির সুবাতাস বহিতে থাকিবে ("কুটীর শিল্পের এক অধ্যায়," **গণরাজ,** দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ১৫ মে ১৯৪৯, পৃঃ ৫)।

পরিশিষ্ট - ১

জীবনপঞ্জি

১৯০২ খ্রিস্টাব্দ : জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার রামপুরহাট গ্রামে মাতুলালয়ে। ভিন্নমতে ১৯০০ তাঁর জন্মসাল। পিতা মৌলভী আবদুল হামিদ। মাতা জরিণা খাতুন। বিদ্যালয় জীবন কেটেছে মাড়গ্রামে (পিতৃগ্রাম) কামালুদ্দিন মিঞার পাঠশালায় এবং অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল মিডল ইংলিশ স্কুলে, কলকাতায় তালতলা হাইস্কুলে এবং কলকাতা মাদ্রাসায়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দ : কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস ক্লাসে ভর্তি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতা শুনে স্বরাজের কাজে আত্মনিয়োগ। এরপর সালারে, জাতীয় বিদ্যালয়ে তিন চার বছর অবৈতনিক শিক্ষকতা।

১৯২৫ : বহরমপুরে বিড়ি কারখানায় চাকরি। নমাজ পরিচালনার ইমাম হিসাবেও কাজ করেন। আবুল কালাম আজাদের প্রেরণায় বহরমপুরে গড়ে তোলেন আল-হেলাল ক্লাব।

১৯২৮ : বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইনটারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৩০ : ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স সহ বি.এ. পাশ, এম.এ. ক্লাসে ভর্তি, খিদিরপুর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা।

১৯৩২ : তাঁর সম্পাদনায় মাসিক **সৌরভ** পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৩৪ : ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ। নঈমা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ।

১৯৩৬ : আইন পরীক্ষা পাশ। প্রথমে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ও আলিপুর কোর্ট এবং পরে বহরমপুর কোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান।

১৯৩৭ : অগ্রজ মইনুদ্দিন হোসায়ন এবং মাতুল আবদুস সামাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় মিলিতভাবে গঠন করেন অ্যানটি-সেপারেট ইলেকটোরাল লিগ।

১৯৩৯-৪২ : বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব।

১৯৪৪ : নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সদস্য হন। বহরমপুরেও প্রতিষ্ঠা করেন কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ।

১৯৪৫ : ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি যোগ দেন দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফজলুল হক ও কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯৪৬ : স্ত্রী বিয়োগ, ইতিমধ্যে চারটি শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যু।

১৯৪৭ : আইনজীবী পেশা ত্যাগ, মুর্শিদাবাদ জেলা লোক সেবক সংঘের সভাপতি।

১৯৪৮ : মুর্শিদাবাদ জেলার রাষ্ট্রীয় সমিতির পাক্ষিক মুখপাত্র **'গণরাজ'** পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি।

১৯৪৮-৮১: বহরমপুর গার্লস কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা।

১৯৫৪ : **'সাপ্তাহিক মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'**র সম্পাদক।

১৯৬০-১৯৬৯ : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য।

১৯৬২-১৯৮৫ : চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্য ও উপদেষ্টা।

১৯৬৭ : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯৭১ : বহরমপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয়।

১৯৮৪ (১৪ই জুলাই) : বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রাঙ্গন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অধিবেশনে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত।

১৯৯১-৯২ : বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত।

১৯৯৩ (৫ই নভেম্বর) : তিরোধান।

পরিশিষ্ট - ২

রেজাউল করীমের গ্রন্থ-তালিকা

বাংলা

১. *পুণ্যবাণী* (অপ্রকাশিত পুস্তিকা); মাড়গ্রাম, বীরভূম, ১৯২১/২২

২. *নবীমাধুরী* (অসমাপ্ত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি); মাড়গ্রাম, ১৯২১/২২

৩. *জিজিয়া* (প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়নি)

৪. *স্পেন বিজয়* (অসমাপ্ত রচনা, 'সৌরভ' পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত), ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

৫. *ফরাসী বিপ্লব;* বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৩

৬. *নয়া ভারতের ভিত্তি;* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

৭. *জাগৃহি*; আর্য্য পাবলিশিং কোং, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

৮. *জাতীয়তার পথে*; বি. এন. ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

৯. *তুর্কীবীর কামাল পাশা;* নূর লাইব্রেরী, ১৯৪১

১০. *পাকিস্থানের বিচার*; দি বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৪২

১১. *মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ;* নূর লাইব্রেরী, ১৯৪২

১২. *আমরা যাহা বিশ্বাস করি* (বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে) নবজীবন সংঘ, কলিকাতা, ১৩৪৮

১৩. *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পালিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা, ১৯৪৪

১৫. *কাব্য-মালঞ্চ* : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক মুসলিম কবিদের কবিতার সংকলন (আবুল কাদিরের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা), নূর লাইব্রেরী, ১৯৪৫

১৬. সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধীজী; পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, কলিকাতা, ১৯৬৯

১৭. *সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হোক*; পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রকাশনী উপসমিতি।

১৮. *সংস্কৃতি-সমন্বয়* : কিছু ভাবনা; বুক ট্রাস্ট, কলিকাতা, ১৯৮৩
জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২

১৯. *নির্বাচিত কবিতা;* সম্পাদনা: আবুল হাসনাত, ২০০২

২০. *ইকবাল প্রসঙ্গে;* সম্পাদনা: আবুল হাসনাত

২১. *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* সম্পাদনা আবুল হাসনাত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি,

1. *For India and Islam,* Calcutta. Chakravarty Chatterjee & Co. 1937.
2. *Anecdotes of Hazrat Mohammad.* Calcutta : Noor Library Publisher, 1939.
3. *Pakistan Examined : With The Partition Schemes of Dr. Latif, Sir Sikandar Hyat Khan.* Calcutta : The Book Company Ltd., 1941.
4. *The Book of the Hour.* (Particulars are not available).
5. *Muslims and the Congress. Collection of Speeches of Muslim Presidents of India National Congress,* Calcutta: Baredra Library, 1941.
6. *Mother Kasturba Gandhi;* Calcutta : Chakravarty Chatterjee & Co., 1944.

পরিশিষ্ট - ৩

রেজাউল করীম সম্পর্কে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধের নির্বাচিত তালিকা

'পূর্ণমানব রেজাউল করীম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-২

১. ১৯৬০ সালের ৩ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে রেজাউল করীম তাঁর কর্মময় জীবনের কথা বলেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও জ্যোতি রায়কে। *বর্তিকা, সম্পাদক : মনীশ ঘটক, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৭, ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ: ৫৫-৫৮।*

২. খাজিম আহমেদ, 'রেজাউল করীম', *গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৮২, পৃ: ২০৫-২০৭।*

৩. জঙ্গাম: *সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা বিষয়ক ত্রৈমাসিক, রেজাউল করীম সংখ্যা*, সম্পাদক : রাকিব উদ্দিন ইউসুফ ও হাতেমুল ইসলাম, ৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৪।

৪. শিখারাণী কুণ্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বন্দেমাতরম, মুসলিম পারসোনাল ল' এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন রেজাউল করীম। *পরিবর্তন, সম্পাদক : পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১১-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৪, পৃ ৩৪-৩৮।*

৫. খাজিম আহমেদ, ' রেজাউল করীম : জীবন ও সৃষ্টি' *স্রষ্টা ও সৃষ্টি : মুর্শিদাবাদ জেলা, গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, ১৯৮৬, পৃ: ৩৮৯-৪০১।*

৬. আবদুল রহমান ফেরদৌসী, "*মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন মুসলিম লেখক*", *তদেব, পৃ: ৪৫৪।*

৭. রেজাউল করীমের সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন আবুল বাশার। এই সাক্ষাৎকার আলোচনায় যুক্ত হয়েছে একটি মূল্যবান ভূমিকা, রেজাউল করীমের জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থতালিকা। *দেশ, সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ, ২২ শ্রাবণ ১৩৯৮, ১০ আগস্ট ১৯৯৯, ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, পৃ: ৪১-৫২।*

৮. শ্যামল রায়, আবুল বাশার, আবুল হাসনাত, বিজয় সিং নাহার, বিভাস মিত্র ও প্রীতি গুপ্তা নিবেদন করেছেন সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও স্মৃতি কথা। *ওভারল্যাণ্ড, রবিবার, ২১ নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ: ৯।*

৯. সুস্নাত দাশ, "রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার ও রেজাউল করিম", *গণশক্তি, রবিবার, ২৮ নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ: ৩।*

১০. জহর সেন, 'শিক্ষাব্রতী রেজাউল করীম', *WBCUTA Journal of Education Vol. 2, No.-3, December 1993, p. 62-64.*

১১. আলাউদ্দীন আহমেদ, "রেজাউল করীমের সমন্বয় চিন্তার প্রেক্ষাপট ও সীমাবদ্ধতা", *সাপ্তাহিক কলম, সংখ্যা ২৩, রবিবার ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ: ১০ ও ১২।*

১২. আবদুল রউফ, "রেজাউল করীম", আকাদেমী পত্রিকা, ৬ *সংখ্যা,* বৈশাখ ১৪০১, মে ১৯৯৪, পৃ: ২২৫-২৩২।

১৩. জহর সেন "রেজাউল করীম : অন্ধতা, সংস্কার ও গোঁড়ামি যাকে স্পর্শ করেনি।" *নতুন ইস্তেহার,* সম্পাদক জামাল গনি, ১৬ মে ১৯৯৪।

১৪. মুজিবর রহমান, " রেজাউল করীমের সমাজ চিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনা", *জনমত বিশেষ সংখ্যা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৪, পৃ: ১৪-১৯।*

১৫. আবুল হাসনাত, *সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, মনীষী রেজাউল করীমের জীবন* ও *ভাবনা,* ১৯৯৪, পৃ ৪ + ৭০ + ৮।

১৬. *স্মরণিকা,* ডঃ রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য, সহকর্মী ও ছাত্রীবৃন্দ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, ১৯৯৪, পৃ: ১২ + ২২।

১৭. *স্মরণিকা,* ডঃ রেজাউল করীম প্রয়াণ বার্ষিকী, ডঃ রেজাউল করীম চর্চাকেন্দ্র প্রস্তুতি কমিটি, বহরমপুর, ১৯৯৪, পৃ: ৬ + ১৬ + ৬।

১৮. আবুল রাকিব, "তিনি নেত্র", *আবার এসেছি ফিরে,* শারদীয়া সংখ্যা, সম্পাদক এবাদুল হক, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ১৯৯৫, পৃ: ১৯-৩৪।

১৯. "রেজাউল করীম (১৯০২-৫.১১.৯৩) *সংসদ বাঙালি চারিতাভিধান,* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রধান সম্পাদক : সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক : অঞ্জলি বসু, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ১৩৭-১৩৮।

২০. জহর সেন, "রেজাউল করীমের দৃষ্টিতে গান্ধীপথ : গান্ধীপথ সতত সৃজ্যমান", *যুগের ডাক,* ১৫ আগস্ট ১৯৯৮।

২১. জহর সেন "রেজাউল করীমের দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম" *যুগের ডাক,* ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ: ১৮-১৯।

২২. জহর সেন, "রেজাউল করীমের দৃষ্টিতে কবি ইকবাল", *শারদীয় গণবার্তা*, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২২১-২২৪।

২৩. জহর সেন, *রেজাউল করীম* (১৯০২-১৯৯৩), সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৪১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৭ + ১৩১।

২৪. আবুল হাসনাত, গৌতম নিয়োগী ও বিষাণ গুপ্ত লিখেছেন রেজাউল করীম সম্পর্কে শতবর্ষ স্মরণ বিভাগে। *এ বাংলার মুখ, তৃতীয় বর্ষ,* প্রথম সংখ্যা ২০০১, পৃ: ৪-১৩।

২৫. জহর সেন, "রেজাউল করীমের দৃষ্টিতে মুক্ত বুদ্ধি" *দর্পণে মুক্তমন*, শারদ সংখ্যা ২০০১, পৃ: ২৫-২৯।

২৬. —,"রেজাউল করীম" *পরিচয় ৪-৬ সংখ্যা ৭১বর্ষ, ২০০২, পৃ: ১-১৪।*

২৭. —, "রেজাউল করীমের দৃষ্টিতে গান্ধীপথ" *সর্বোদয়,* বর্ষ ৪৬, ১০ সংখ্যা ২৯ জুলাই ২০০২ পৃ: ৫৭, ৫৯।

২৮. —, "পূর্ণ মানব রেজাউল করীম", *সংবীক্ষণ* (দশম সংকলন, ২০০২) পৃ: ২১৪-২২২।

সংযোজন:

১. নাম নেই, 'করীম সাহেব', *মুর্শিদাবাদ সন্দেশ,* ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, বহরমপুর সম্পাদক গৌরী বক্‌সী।

২. প্রীতি গুপ্তা, 'সরস্বতী শ্রুতি মহতাং মহীয়তাম' *জনমত,* বিশেষ শারদ সংখ্যা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

৩. আবুল হাসনাত, 'সমন্বয় ভাবনার অগ্রপথিক রেজাউল করীম', *জনমত* ১২ ও ১৯ ফাল্গুন ১৩৯০। ২৪ বর্ষ শেষ সংখ্যা ও ২৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ৩ মার্চ ১৯৮৪।

৪. দীপংকর চক্রবর্তী, 'একটি মহান জীবনের অবসান' সম্পাদকীয় নিবন্ধ, *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ,* সমীক্ষামূলক পাক্ষিক সংবাদপত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, নভেম্বর ১৬-৩০, ১৯৯৩।

৫. আবদুল জাব্বার, 'অমর বক্তা' *উত্তরকাল,* সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদক : আহসান আলী, মার্চ ১৯৯৪, শেখপাড়া, রাণীনগর।

৬. 'প্যান্ডোরার বাক্সের মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে'— রেজাউল করীমের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন—খাজিম আহমেদ ও সন্তোষ মণ্ডল। *তদেব,* এই সাক্ষাৎকারটি কাটরা দাঙ্গার পর 'ঝড়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারেরই পুনর্মুদ্রন *উত্তরকাল*-এ।

৭. বিশ্বজিৎ মণ্ডল, 'দ্বন্দ্বদীর্ণ রেজাউল করীম এক তরুণের জিজ্ঞাসা' *তদেব,* পৃ: ৩৫।

৮. শক্তিনাথ ঝা, 'বঙ্গসাহিত্যে রেজাউল করীম' তদেব পৃ: ৪৩, এটি '**জঙ্গম**' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটির পুনর্মুদ্রণ তবে নতুন একটি অনুচ্ছেদ এখানে যুক্ত হয়েছে।

৯. আবুল হাসনাত, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রেজাউল করীম' *তদেব,* পৃ: ৪০।

১০. এস হজরত আলী, 'কড়া নাড়ে' রেজাউল করীম স্মরণে কবিতা, *তদেব,* পৃ: ৪০।

১১. দেবাজিত মণ্ডল, 'নটে গাছটি মুড়োল' রেজাউল করীম স্মরণে কবিতা, *তদেব,* পৃ: ৪১।

১২. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'মানব প্রেমিক' রেজাউল করীম স্মরণে কবিতা, *তদেব,* পৃ: ৪২।

১৩. নাম নেই, 'করীম সাহেব', *মুর্শিদাবাদ সন্দেশ,* ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫, বহরমপুর, সম্পাদক, গৌরী বক্‌সী।

১৪. আবুল হাসনাত, 'বহরমপুরে রেজাউল করীম : প্রাক স্বাধীনতা পর্ব' *বইমেলা স্মরণিকা,* মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৪।

১৫. খাজিম আহমেদ, 'ডঃ অধ্যাপক রেজাউল করীমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'। এটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রবন্ধ। ওভারল্যাণ্ড ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৯১। সম্পাদক অজিতকুমার ভাওয়াল।

১৬. খাজিম আহমেদ, 'ডঃ অধ্যাপক রেজাউল করীমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'। এই সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে শ্রীকরীম নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। *উদ্ভাবনী,* প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৮৬। সম্পাদক ডঃ মিহির কুমার দত্ত।

১৭. খাজিম আহমেদ, 'রেজাউল করীম : সম্প্রীতি ভাবনা' *স্বরান্তর,* নবম বর্ষ, প্রথম বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৬।

১৮. খাজিম আহমেদ, 'রেজাউল করীম : সম্প্রীতি ভাবনা' স্মরণিকা, টেক্সটাইল মোড় পূজা কমিটি ১৪০৩ (১৯৯৬)। সম্পাদক : প্রাণময় ব্রহ্মচারী। এটি পূর্বোক্ত লেখাটির পুনর্মুদ্রণ।

১৯. আবুল হাসনাত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ : রেজাউল করীম' জনমত, ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৯ ও ২৭শে নভেম্বর ১৯৯৯, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত।

২০. প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, 'রেজাউল করীম : জহর সেনের দৃষ্টিতে' গণকণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০০১, সম্পাদক : প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। এটি ডঃ জহর সেনের 'রেজাউল করীম' বইটির সমালোচনা। লেখাটি গণকণ্ঠ পত্রিকাতেই পুনর্মুদ্রিত হয় ৩০ নভেম্বর ২০০২-এ।

২১. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, 'সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক রেজাউল করীম' *মুর্শিদাবাদের মণীষী*, আকাশ প্রকাশনী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০০১।

পরিশিষ্ট - ৪

ডঃ রেজাউল করীমের চোখে

বন্দেমাতরম্, মুসলিম পার্সোনাল ল' এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি

প্রশ্ন: 'বন্দেমাতরম্' শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ কী?

রেজাউল করীম: বন্দেমাতরমের স্বাভাবিক অর্থ—হে দেশমাতা, তোমাকে বন্দনা করি।

প্রশ্ন: আচ্ছা, ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশকে মাতা বলে সম্বোধন করা যায় কি?

রেজাউল করীম: ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেশকে মাতা বলে সম্বোধন করা চলে কিনা সে কথাটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। ইসলামের সময়ে আরব দেশেই দেশকে মাতা বলে সম্বোধন করার বহু উদাহরণ আছে। মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের লিখিত, 'মোস্তফা চরিতে'র এক জায়গায় আছে—মক্কা ছেড়ে যখন মদিনা 'হিজরত' করে চলে যাচ্ছেন তখন তিনি বলেছিলেন—'হে দেশমাতা মক্কা, আজ তোমাকে ছেড়ে চললাম'। সুতরাং 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে দেশকে মাতা বলে সম্বোধন করা ইসলাম-বিরোধী নয়। 'বন্দনা' কথাটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। মুসলিম লিগের প্রার্দুভাবের সময়ে লিগের নেতারা 'বন্দনা' কথাটা মানুষের বেলায় যখন তখন ব্যবহার করতেন— যেমন নজরুল বন্দনা, জিন্না বন্দনা, নাজিমুদ্দিন বন্দনা ইত্যাদি। কোন নেতাকে সংবর্ধিত করার সময় যে পুস্তিকা ছাপান হত তাতে ঐ ধরনের কথা বলা হত। যথা—অমুক সভায় নজরুল বন্দনা হবে। তমুক সভায় লিয়াকত আলী বন্দনা হবে ইত্যাদি। সুতরাং দেশকে বিশেষভাবে বন্দনা করাটাও কোন ক্রমে ইসলাম-বিরোধী নয়। প্রকৃত ইসলামের দেশপ্রেম একটা প্রশংসনীয় জিনিস। হাদীশ শরীফে আছে—'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ইমান'—অর্থাৎ দেশপ্রেম মুসলমানের কাছে ইমানের (ধর্ম বিশ্বাস) অঙ্গ। সুতরাং 'বন্দেমাতরম্' কবিতায় দেশকে যেভাবে বন্দনা করা হয়েছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় নয়।

প্রশ্ন: 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে নিয়ে দেশজুড়ে নানা মানুষের মধ্যে নানা মত জেগে ওঠার কারণ কী?

রেজাউল করীম: উক্ত গানে হিন্দুদের পূজ্য দেবদেবীর নাম করা হয়েছে ও প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু একেশ্বরবাদী কোন মুসলমান তা কখনই মানতে পারেন না। মুসলমানগণের ওই সমস্ত অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সে যুগের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের শেষের দিকটা বাদ দিয়েছেন। এখন বন্দেমাতরমের যে অংশটি গাওয়া হয় সেটি গানের প্রথম অংশ। কোন কোন অতিউৎসাহী লোক কোন কোন সভায় কংগ্রেস-বর্জিত অংশটাও গান। সুতরাং সে অংশটা নিয়ে চেঁচামেচির কোন প্রয়োজন নেই। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্বীকৃত অংশে এমন একটি জায়গা আছে, যা কোন কোন হিন্দুও স্বীকার করেন না। যথা 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িণী' ইত্যাদি। যে মূর্তির সামনে 'আনন্দমঠ' বর্ণিত মহেন্দ্রকে উপস্থিত করা হয়েছিল সে দৃশ্যটা একবার স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। মহেন্দ্র দেশমাতার মুর্তি দেখে বলে উঠলেন—'না, এতো আমার মা নয়। আমার মা দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। তখন সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন, 'আমরা কিন্তু দেশমাতা ছাড়া আর কাউকে মা বলে স্বীকার করি না।' মহেন্দ্র ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু সত্যানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক—তাঁর প্রেমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না; সেইজন্য তিনি দেশমাতাকেই কেবল 'মা' বলে জেনেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেশমাতাকে দুর্গারূপে কল্পনা করতে অনেক হিন্দুরও আপত্তি রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার। কারণ, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশমাতাকে মাতা বলে বন্দনা করা কোন অন্যায় নয়।

প্রশ্ন: 'বন্দেমাতরমে'র বিরোধিতার ইতিহাস সম্পর্কে আপনার কিছু জানা থাকলে বলুন।

রেজাউল করীম: 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে কেন্দ্র করে লিগের সময় হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কোন কোন বিষয়কে আক্রমণ করলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয় লিগ নেতারা তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বের করতে লাগলেন। কোন পথে মুসলিম স্বার্থের আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে এটাই ছিল লিগের প্রধান উদ্দেশ্য। বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যেত লিগ চায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কাউন্টার-মুভমেন্ট। আমার বেশ মনে পড়ছে একথাটা আমি মৌলানা আকরাম খাঁর মুখেই শুনেছিলাম। মৌলানা আকরাম খাঁ তখন লিগে ডুব দিয়েছেন। তাঁরা সবাই মিলে তখন জিন্না সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে একে একে বলতে লাগলেন, কোন কোন বিষয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসের বিরোধাচরণ করবে। তাঁরা নানা অভিযোগ লিখতে লাগলেন। অভিযোগগুলি লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একজন লিগ নেতা বলে উঠলেন, 'আর একটা আপত্তিকর জিনিস আছে—'সেটা হল বন্দেমাতরম্'। তখন জিন্না সাহেব বলে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্'

কেয়া চিজ হ্যায়? তখন বাংলাদেশের লিগ নেতারা জিন্না সাহেবকে জানালেন, 'বন্দেমাতরম্' এমন একটা গান যা মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে তুলবে। এ গানের কথা প্রচার করে আমরা দেশব্যাপী লিগের ঝাণ্ডা ওড়াব। এই মুসলিম লিগ গড়ে উঠেছিল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের নেতৃত্বে। এই হল বন্দেমাতরমের বিরোধিতার ইতিহাস। যাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবাসীর বিরাট আন্দোলনের মধ্যে একটা ধ্বংসমুখী ফাটল গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন: বর্তমানে বন্দেমাতরমকে নিয়ে আর কোন বিরোধ আছে নাকি?

রেজাউল করীম: দ্যাখ, বিরোধ জিনিসটা অন্য কিছুই নয়, এর গভীরতাও বেশি দূর গড়ায় না—এটা কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার একটা কৌশল মাত্র। এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তৎকালীন লিগ নেতারা আর এর ইন্ধন জুগিয়েছিল বৃটিশ। কিন্তু সে যুগ সে আন্দোলনকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। এখন মানুষ অনেক সচেতন, অনেক চিন্তাশীল। কোন কিছু না বুঝে ঝোঁকের মাথায় তাঁরা আর পা বাড়ান না। তবে তখনকার মানুষও যে এ বিষয়ে চিন্তা করেননি তা নয়, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে রোধ করা যায় এ নিয়ে তখনকার বহু কংগ্রেসী নেতা ঠিক করলেন যে—গানের যে অংশটিকে নিয়ে এত বিরোধ সেটিকে বাদ দিয়ে গাওয়া হোক। কিন্তু হিন্দু সমাজ এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তাঁরা গোটা গানটিকেই গাইতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার কিছু পূর্বে কংগ্রেস রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'জনগণমন অধিনায়ক'-কেই জাতীয় সঙ্গীত বলে ঘোষণা করলেন। যেখানে বন্দেমাতরম নিয়ে আপত্তি সেখানে 'জনগণমন অধিনায়ক' এই গানটিকে গাওয়া হবে।

একটা গানকে নিয়ে কত আন্দোলন, কত রাগারাগি, কত আলোচনা, দেশ ভাগাভাগি, কত কী ঘটে গেল—তবু মানুষের চেতনা জাগল না। একটা গান গাইলেই কি কোন ধর্মের আদর্শ নষ্ট হয়? তাহলে এখানে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, 'বন্দেমাতরম্' গানকে নিয়ে এত যে মুসলিমদের মধ্যে আপত্তি, তা একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুসারেই হয়েছে।

এখন এই গানকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আর কোন বিরোধ নেই। একটা গানকে নিয়ে গাওয়া না গাওয়া তার সঙ্গে ইসলামের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক— তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা দেশপ্রেম মূলক Allegorical গ্রন্থ লিখলেন। সেই Allegorical গ্রন্থটিকে নিয়ে এত মাতামাতির কী কারণ থাকতে পারে? এই ভারতবর্ষ বহুধর্মের দেশ। সেখানে একটা ধর্মের সঙ্গে আর একটা ধর্মের কোন এক স্থানে

বিরোধের কারণ থাকা অসম্ভব নয়। কাজেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার একান্তভাবেই প্রয়োজন।

প্রশ্ন: ভারতে তো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু সেখানে আজ সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গা হাঙ্গামা যেভাবে চারদিক থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার প্রতিকারের উপায় কী?

রেজাউল করীম: এর একমাত্র উপায় 'পরমত-সহিষ্ণুতা'। সব ধর্মকেই ভালবাসতে হবে। কেউ যদি ভাল না বাসেন, তবে তাঁর আচরণকে সহ্য করতে হবে। এই হল প্রতিকারের উপায়।

প্রশ্ন: ভারত একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। তাহলে এখানে আইন কত রকমের হতে পারে?

রেজাউল করীম: দ্যাখ, ভারতে আইন দু'রকম হওয়াই উচিত। এক রাষ্ট্রীয় আইন, দুই ধর্মীয় আইন। এই দুই আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে—এটা নিশ্চয় স্বীকার কর। প্রত্যেক রাজ্যে বা রাষ্ট্রে এমন সব আইন পাশ হয় বা সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার এমন সব আইন আছে যা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রযোজ্য হতে পারে। বিবাহ, ধর্মানুষ্ঠান— এই সমস্ত বিষয়ের ওপর রাষ্ট্র সাধারণত হস্তক্ষেপ করে না। তবে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যা রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করে। যেমন কোন মুসলিম ছেলে কোন অ-মুসলিম মেয়েকে জোরপূর্বক (অর্থাৎ তার মতের বিরুদ্ধে) যদি বিবাহ করতে উদ্যত হয় এবং মেয়েটি যদি রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চায় সেখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য। কিন্তু কোন মুসলিম ছেলে যদি কোন অ-মুসলিম মেয়েকে (পরস্পর সম্মত হয়ে) বিবাহ করে সেখানে রাষ্ট্রের কিছু করার নেই। তবে মুসলিম আইন কিন্তু এতে বাধা দেবে কারণ মুসলিম ছেলে বা মেয়ে কোন অ-মুসলিম ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না।

প্রশ্ন: আমি মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কেই আপনার কাছে কিছু জানতে চাইছি। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

রেজাউল করীম: হ্যাঁ, এইবার ঐ আলোচনাতেই আসছি। ধর একটি মুসলিম পরিবারের ছেলে বা মেয়ে অপর একটি অ-মুসলিম পরিবারের ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ করতে উদ্যত হল। তারা পরস্পর সম্মত। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুসারে এ বিবাহ কখনই হতে পারে না। এ বিবাহ আইন-বিরোধী। তবে এই যে মুসলিম আইন, এটাও কিন্তু একমাত্র ইসলামিক রাষ্ট্রেই চলতে পারে।

প্রশ্ন: কিন্তু ভারত তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এখানেও কি এই বিবাহ অসিদ্ধ?

রেজাউল করীম: না, ভারতের মত রাষ্ট্রে এই বিবাহ অসিদ্ধ নয়। সেকুলার রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের ছেলেমেয়েদের বিবাহকে সিদ্ধ বলবে।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহের পর তাদের যে সন্তান-সন্ততি হবে, সেকুলার রাষ্ট্র আইন অনুসারে তাকে লেজিটিমেট চাইল্ড বলবে। এখানে কোন ধর্মীয় আইন বা পার্সোনাল ল' স্বীকৃত হবে না। সারা ভারতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলোয় খোঁজ নিলে দেখা যাবে এ ধরনের 'অসামাজিক' বিবাহ ভুরি ভুরি হচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েরা সব সিদ্ধ ও নিষ্পাপ। কোন ধর্ম তাদের পার্সোনাল বিবাহকে নস্যাৎ করতে পারে না। ভারত সেকুলার রাষ্ট্র। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করাই ভারতের লক্ষ্য। সুতরাং এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি আর এক সম্প্রদায়ের ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বিবাহ হয়, সেটা সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষে ভালই। সেকুলার রাষ্ট্র দেখে পার্সোনাল ল'-এর ব্যাপকতা যত কমে আসে ততই সেকুলার রাষ্ট্রের সাফল্য। ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বহু অংশে সেকুলার ল' প্রচলিত, সে সমস্ত দেশে পার্সোনাল ল'-এর ব্যাপকতা নেই। পার্সোনাল ল'-এর ব্যাপকতা আমাদের এই ভারতেই বেশি।

প্রশ্ন: ভারতের মত দেশে সেকুলার আইনের আদর্শকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হলে কী কী উপায়ে অবলম্বন করতে হবে?

রেজাউল করীম: এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে যাতে পার্সোনাল ল'-এর পরিধি সঙ্কুচিত হয়। পার্সোনাল ল'-এর ব্যাপকতা যত কমে আসবে সেকুলার রাষ্ট্রের আদর্শ তত বেশি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হবে। পার্সোনাল ল'-এর ওপর গুরুত্ব এখন থেকেই কমিয়ে আনতে হবে। শত শত বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্সোনাল ল'-এর নামে কত অন্যায়, অবিচার, পাপমূলক কাজ ঘটে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইংরেজ আমলে যখন সতীদাহ প্রথা রহিত হল, বহুবিবাহ প্রথা রহিত হল, হিন্দুদের মধ্যে তখন নানান ধরনের প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল। এখন তো সারা হিন্দু সমাজে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলমান সমাজকেও প্রস্তুত হতে হবে, তাঁদেরকেও একাধিক বিবাহের দাবি পরিত্যাগ করতে হবে। হিন্দু সমাজে আগে ডিভোর্স বা স্ত্রী পরিত্যাগ করা হত না। কিন্তু এখন হিন্দু নারীকে রাষ্ট্র এ অধিকার দিয়েছে, অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন, লাঞ্ছনা ইত্যাদির কারণ দেখিয়ে নারী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে।

মুসলিম বিবাহ সম্পর্কে বহু আইন প্রচলিত আছে যা মানবোচিত নয়। এই অমানবিক আইনের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। সামান্য মাত্র কারণে মুসলিম পুরুষ স্ত্রী ত্যাগ বা তালাক দেওয়ার যে অধিকার আবহমানকাল ধরে ভোগ করে আসছে, স্বামীর হাত থেকে সে অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আইন অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলিম পুরুষ যখন কোন স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সেই তালাকপ্রাপ্তা নারীর অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখ তো? তার ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এই বিরাট

পৃথিবীতে তখন সেই হতভাগিনী তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটি নিদারুণ অসহায়। তার সহায় নেই, সম্বল নেই, আশ্রয় নেই। সে কোথায় থাকবে, কী খাবে? তার পিতামাতা তার ভরণ-পোষণে অনিচ্ছুক।

তাই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন—'তালাক দেওয়া স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার পূর্বের স্বামীকেই বহন করতে হবে। সেই মেয়ে যদি পুনরায় বিবাহ না করে তবে তার জীবদ্দশায় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সেই স্বামীকেই বহন করতে হবে।' সুপ্রিম কোর্টের এই রায় যথাযোগ্য হয়েছে। আমি মনে করি যাঁরা এই রায়ের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা ভুল পথে চলছেন। অহিতকর এই ব্যক্তিগত আইনের সংশোধন হওয়া একান্তই দরকার। এতে সকলেরই মঙ্গল হবে।

প্রশ্ন: ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

রেজাউল করীম: দেখ, ভারত একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে চলছে। নানাদিক থেকে নানা রকম দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উঠছে। এইসব পরস্পর-বিরোধী দাবি-দাওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়। ইংরেজ আমলে আমাদের নেতারা ভাবতের জাতীয় আদর্শকেই প্রচার করেছেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের ভেদনীতি দিয়ে ভারতের জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তাদের সেই উদ্দেশ্য যে কিছুটা সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ দেশ বিভাগ। দেশ বিভাগের পর দেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতের শত অসুবিধার মধ্যেও পুনরায় জাতীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করলেন। তাঁদের শ্লোগান হল—'সারা ভারতে হবে একজাতি, একপ্রাণ, একতা।'

ভারতকে সেকুলার রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল। সেকুলার আদর্শ সাম্প্রদায়িক আদর্শ ও ভেদবোধকে স্বীকার করে না। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক এই ভারতকে আবার ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে। শিখ জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদ—সব যেন একসঙ্গে সেকুলার রাষ্ট্রের আদর্শকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তার ফলে আবার পূর্বের মত অন্য ধরনের সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজ আহ্বান করি প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের, তাঁরা যেন এই নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। না হলে ধ্বংস অনিবার্য। একবার দেশ বিভাগ হয়ে গেল, আবারও এই সর্বনাশের সূত্রপাত হতে চলেছে। বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে এই সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই নেই। ফরাসি সম্রাট যোড়শ লুইয়ের মত হয়ত আমাদেরকেও একদিন বলতে হবে আমার পরে মহাবন্যা After me the Deluge ....।

পরিবর্তন ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫/৩৪

পরিশিষ্ট - ৬

চারণের মর্মবাণী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কালের বক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই জগত যেখানে অন্নের প্রাচুর্য্য ছিল ঘরে ঘরে। বারো মাসে অনুষ্ঠিত হোতো তেরো পার্ব্বন, গোষ্ঠে বইতো দুধের বান, গ্রামগুলি মুখরিত হ'য়ে থাকতো মাকু চালানোর ঠকাঠক শব্দে, গৃহস্থের আঙিনা হাসতো সোনার ধানে, বাংলার শিল্পদ্রব্যে বোঝাই হ'য়ে বাঙালী সদাগরের জাহাজ চলতো সমুদ্রবক্ষ অতিক্রম ক'রে দেশদেশান্তরে।

ধনধান্যে ভরা সেই দেশকে লেলিহান রসনা দিয়ে মুছে নিলো ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী। হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ম'রে গেল। যারা মরলো না তারা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পড়লো কোম্পানীর কবলে। ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্মচারীদিগকে হুকুম দিলেন, কোম্পানীর খাজনা পড়ে থাকলে চলবে না; যেমন ক'রে পারো আদায় কর। খাজনা আদায় হোলো বটে কিন্তু বাংলাব চাষীর সর্ব্বস্ব গেল। বাঙালী কৃষকের হালের গরু-বেচা টাকায় ইংরেজ দুটো কাজ করলো—বিলাতে কাপড়ের কল বানালো আর নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চালালো। সেই থেকে বাঙলার পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড গেল চিরদিনের জন্য ভেঙে। যেন ভুলে না যাই, ম্যাঞ্চেষ্টারের জয়ধ্বজা উড়ছে বাংলার সর্ব্বস্বান্ত গ্রামগুলির চিতাভস্মের উপরে।

আজ একটা নতুন জগতে আমরা এসে পড়েছি। এই নূতন জগতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত নর-কঙ্কালের দুঃসহ দারিদ্র্য। এই নূতন জগতের জন্য প্রয়োজন নূতন ধরণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার। আত্মা-অনাত্মার বিচার করবার আমাদের অবসর নেই আজ। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ নিয়ে আলোচনা করবারই বা সময় কোথায়? পরকাল আছে কি নেই—কালিদাসের জন্মস্থান বাংলাদেশে না বাংলার বাহিরে—এসব প্রশ্নেরও সমাধান করবার দিন আজ নয়। আমাদের সামনে এখন একটি মাত্র কর্ত্তব্য রয়েছে আর সেই কর্ত্তব্য হচ্ছে, কোটী কোটী জীবন্ত নর-কঙ্কালকে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচিয়ে তোলা। যে দেশে কয়েদীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বুই জন

জেলখানায় আসে উপবাসী স্ত্রী-কন্যার জন্য চুরি করতে বাধ্য হ'য়ে—সে দেশে রাসলীলার ব্যাখ্যা করবার আর নীতির বড়ো বড়ো কথা আওড়ানোর কোনো মানে হয় না।

> Ninety-five percent of criminals are men who have committed offences because they have wanted food for themselves, their wives and children.

এই কথাই সেদিন বললেন ম্যাজিস্ট্রেট জে, কে বিশ্বাস রোটারি ক্লাবের বক্তৃতায়। ঠাকুর বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না আর এ কথা খুব খাঁটি কথা। যে দেশে হাজার হাজার মানুষ একবেলাও পেট পুরে খেতে পায় না সে দেশে শাস্ত্রের কথা আউড়িয়ে মানুষকে ধার্ম্মিক করবার চেষ্টা কত বড়ো একটা প্রহসন—ঋষি বঙ্কিম সে কথা বুঝেই কমলাকান্তে মার্জ্জারীর মুখ দিয়ে বলিয়াছেন,

> "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটী নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন তিনি আগে তিন দিন উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে তবে তিনি চোরকে স্বচ্ছন্দে ফাঁসি দিবেন।"

তাই তো আমরা চারণের দল এই নিরন্ন দেশের কোটী কোটী সর্ব্বহারাদের লক্ষ্য ক'রে বলছি, তোমরা সর্ব্বাগ্রে বাঁচো, যেমন ক'রে পারো সর্ব্বাগ্রে দেহের সঙ্গে প্রাণকে যুক্ত রাখবার জন্য সচেষ্ট হও। ধর্ম্মের সমস্যা, সাহিত্যের সমস্যা, দর্শনের সমস্যা, নীতির সমস্যা—সব সমস্যা স্থান হচ্ছে বাঁচার সমস্যার পরে।

কিন্তু কোটী কোটী মানুষের বাঁচার সমস্যার সমাধানের পথ কোথায়? দেশের যারা ভালো ছেলে তারা কবিতা লিখুক, ছবি আঁকুক, মন্দিরে ব'সে জপ করুক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস লিখে হাততালি পাক। আমরা যারা চারণ—আমাদের জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা হ'য়ে জ্বলছে একটীমাত্র সংকল্প আর সে সংকল্প হচ্ছে, জগতের যারা সর্ব্বহারা—দৈন্যের অভিশাপ থেকে তাদের মুক্তি। দুধের অভাবে যতক্ষণ একজন শিশুও মাতৃকোলে কাঁদবে ততক্ষণ আমাদের চারণদেব স্বর্গ নেই, মুক্তি নেই, আনন্দ নেই। অবশ্য এটা ঠিকই যে মানুষের তৃপ্তি কেবল রুটিতে নয়। শুধুই বেঁচে থাকার সমস্যা হচ্ছে পশুর সমস্যা। কেমন ক'রে বাঁচবো—এই প্রশ্ন জেগেছে মানুষেরই মনে। সুতরাং আমরা চারণেরা সমাজের প্রত্যেকটী মানুষকে কেবল যে অন্নের অধিকারী করতে চাই, তা নয়—তাকে আমরা সংস্কৃতিরও অধিকারী করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের যেমন দেহ আছে তেমনি আত্মাও আছে। এই আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তাকে উদাসীন রাখতে চাই নে। পরিপূর্ণ মানুষ বলতে আমরা বুঝি সেই মানুষ যার দেহে আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, মগজে আছে জ্ঞানের

শিখা, আত্মায় আছে প্রেমের বিশালতা। সেই সমাজকেই আমরা আদর্শ-সমাজ ব'লে বিশ্বাস করি যে সমাজে প্রত্যেকটী মানুষ মুক্ত এবং পরিপূর্ণ। আমরা চারণেরা পৃথিবীতে যে Classless Society কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সহস্র মরণকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছি— সেই শ্রেণীহীন সমাজ হোলো এই আদর্শ-সমাজ। I want every individual to become a full-blooded and fully developed member of society—এই স্বপ্ন কেবল গান্ধীর স্বপ্ন নয়—প্রত্যেকটী চিন্তাশীল মহামানবের স্বপ্ন। কিন্তু ভবিষ্যতের শুধু স্বপ্ন দেখে আমাদের তৃপ্তি নেই। স্বপ্নকে বাস্তবে কেমন ক'রে রূপ দেওয়া যায় তার কথা আমরা দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত ভেবেছি। ভেবে ভেবে দেখেছি, আদর্শসমাজ সৃষ্টির প্রথম সোপান হ'চ্ছে গৃহে গৃহে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করা। যে মানুষ নিরন্ন তার কাছে র‍্যাফেলের ম্যাডোনার চাইতে ডাল-ভাতের প্রয়োজন অনেক বেশী।

কেমন ক'রে গৃহে গৃহে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করা যায় তার সন্ধানও আমরা চারণেরা পেয়েছি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ব্যতীত কোটী কোটী সর্ব্বহারাকে দৈন্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যে অসম্ভব—এই মহাতত্ত্বকে আমরা ধ্রুব সত্য বলে জেনেছি। এদেশ থেকে ইংরেজ চলে গেলেই আমাদের দুঃখ-নিশার অবসান হবে—এমন বিশ্বাস আমরা মনের মধ্যে পোষণ করিনে। একদল শ্বেতকায় ধনীর আসনে একদল কৃষ্ণকায় ধনী উপবেশন ক'রে যদি রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করবার সুযোগ পায় নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য তবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে যাবে। জন্মভূমির বুক থেকে বিদেশী-শাসনের জগদ্দল পাথরকে সকলের আগে অপসারিত করতেই হবে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহেরই স্থান নেই। আমরা শুধু বলতে চাই, সেই পাথরকে অপসারিত করলেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে না। জাতি কর্ত্তৃক জাতির শোষণকে বন্ধ করা যেমন প্রয়োজনীয়, শ্রেণী কর্ত্তৃক শ্রেণীর শোষণকে বন্ধ করাও তেমনি প্রয়োজনীয়। Imperialism কে আঘাত করবার যতখানি দরকার আছে, Capitalism-কে আঘাত করবারও ততখানি দরকার আছে। বিদেশী ধনীদের লোহার শৃঙ্খল আর স্বদেশী ধনীদের সোনার শৃঙ্খল—সর্ব্বহারাদের কাছে এই দুই শৃঙ্খলের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে আমরা বিশেষ লাভবান হবো না যদি সে স্বাধীনতা অর্থনৈতিক মুক্তিকে বহন ক'রে না আনে সর্ব্বহারাদের দ্বারে দ্বারে। এই অর্থনৈতিক মুক্তি জনসাধারণের জীবনে ততদিন কায়াহীন ছায়া হয়ে থাকবে যতদিন জমি, খনি আর বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক হ'য়ে রইবে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের দল। পয়সার জোরে রাষ্ট্রশক্তিকে মুঠোর মধ্যে রেখে তারা জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে যেমন আমেরিকায় কৃষক-মজুরদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি

খেলছে রকফেলার আর কার্ণেগীর দল। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাবার জন্য যেমন নেপোলিয়নের প্রয়োজন ছিল, আজ জগৎ জুড়ে ধনকুবেরদের যে রাজত্ব চলেছে তারও অবসান ঘটাবার জন্য তেমনি নূতন একজন নেপোলিয়নের প্রয়োজন এসেছে। রেডিও আর এরোপ্লেনের কষ্টিপাথরে আমরা আজ সভ্যতার মূল্য নিরূপণ করতে যাবো না—আমরা সেক্সপীয়রের কাব্য, র‍্যাফেলের ছবি আর তাজমহলের সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি দিয়েও সভ্যতার বিচার করবো না। আমাদের কাছে বর্তমান সভ্যতাকে বিচার করবার মাপকাঠি শুধু একটী আর এই মাপকাঠিটী হোলো সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল। আমাদের এই সভ্যতা কি কোটী কোটী কৃষকের ও শ্রমিকের জীবনে আনন্দ আনতে পেরেছে? তা যদি না পেরে থাকে তবে এ সভ্যতাকে বর্ব্বর-সভ্যতা বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না পেলে আমরা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাতে পারবো না। রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ধনীদের সম্পত্তিকে সতত রক্ষা করছে। জমিদারের প্রত্যেকটি গোমস্তার পিছনে রয়েছে একজন ক'রে লাল-পাগড়ি-পরা কনষ্টেবল। খাজনা দেবো না বললেই মাল ক্রোক অনিবার্য্য। সুতরাং গান্ধীর ভাষায়—

> The entire strength of the country must be used for ousting the third and usurping party.

আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা নিয়ে কোনো প্রকারের আত্মকলহ এখন সর্ব্বনেশে হবে। দেশের সমস্ত শক্তিকে এখন সংঘবদ্ধ করতে হবে একটী মাত্র সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য আর এই সংকল্প হোলো সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ। আমরা বিশ্বাস করি, কংগ্রেস হোলো সেই প্রতিষ্ঠান যার পতাকাতলে মিলিত হ'য়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হবে সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা চারণেরা, তাই, প্রাণপণে চেষ্টা করবো কংগ্রেসকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী ক'রে তুলতে। আমরা কাজের দ্বারা, কথার দ্বারা অথবা লেখার দ্বারা এমন কিছু করবো না যার জন্য কংগ্রেসের অথবা কংগ্রেসের জননায়কগণের মর্য্যাদার কোনরূপ লাঘব হবার আশঙ্কা থাকতে পারে।

কংগ্রেসকে ভিত্তি ক'রে জনসাধারণকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হচ্ছে এখন আমাদের সকলের বড়ো কাজ। কংগ্রেসকে ক'রে তুলতে হবে দেশের লক্ষ লক্ষ চাষী-মজুরের প্রতিষ্ঠান। তারা যেদিন কংগ্রেসের মধ্যে এসে সমবেত কণ্ঠে বলবে, বিদেশী-শাসনের অন্যায়কে জীবন গেলেও সহ্য করবো না— সেদিন সাম্রাজ্যবাদের লৌহদুর্গ তাসের ঘরের মত ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। এই মহাসত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে গান্ধী তাই বলছেন,

> Let them everywhere knit themselves together and have a consciousness of their strength.

আমাদের চারণদের সামনে এখন একমাত্র কাজ, জনসাধারণকে সংঘবন্ধ ক'রে আত্মশক্তির প্রাচুর্য্যে তাদের বিশ্বাসবান ক'রে তোলা।

আমাদের অভিবাদনের কায়দা, ইউনিফর্ম এবং নিয়মাবলী দেখে কারও কারও মনে হতে পারে আমরা ফ্যাসিষ্ট, নাৎসী বা ঐ জাতীয় কোনো দল সৃষ্টি করতে চাই। একথা তাই অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণা করা আমরা প্রয়োজন মনে করি—ফ্যাসিষ্ট অথবা নাৎসী আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে বিশ্বের মঙ্গলের পথে আমরা ঘোর অন্তরায় বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়। আমরা পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবন্ধ হ'য়ে শান্তিতে বাস করতে চাই। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—হিংসা ও কোন প্রকার মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতে আমরা একেবারেই প্রস্তুত নই। আমরা বিশ্বাস করি, কোনো উচ্চ নিষ্কলঙ্ক আদর্শে পৌঁছাতে গেলে পন্থাও নিষ্কলঙ্ক হওয়া প্রয়োজনীয়। সত্যাগ্রহকে আমরা স্বাধীনতালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

ভগবানকে যাঁরা একমাত্র আশ্রয় মনে ক'রে জীবনে আনন্দ, শক্তি ও সান্ত্বনা পান—তাঁদের বিশ্বাসকে আমরা অশ্রন্ধা করিনে। আবার ভগবদ্ভক্ত না হয়েও লেনিনের অথবা বুদ্ধের মতো একটা বিরাট আদর্শের জন্য বাঁচতে পারা যায়—এ কথা মানতেও আমাদের কোনো বাধা নেই। মানুষের জীবনে অর্থের কামনা আর সব বাসনাকে ছাড়িয়ে আছে—একথা আমরা মানিনে। অর্থকে সে চায় বটে— কিন্তু খ্যাতির কামনাও কি তার অন্তরে এক প্রকাণ্ড স্থান অধিকার ক'রে নেই? আর অনেক সময়ে খ্যাতির কামনা কি খ্যাতির জন্যই নয়? বড়ো বড়ো কল-কারখানার বিরোধী নই আমরা, আমাদের দেশে তাদের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কুটীরশিল্পের প্রসারকেও আমরা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি, কুটীরশিল্প আর কল-কারখানা—উভয়ের একত্র অবস্থান খুবই দরকার।

এমন একটা স্বতন্ত্রদল গড়ার সার্থকতা কি—এ রকম প্রশ্ন কোনো কোনো মনে এসে গেছে। এর উত্তর দিতে গিয়ে বলতে চাই, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এই নিদারুণ সংঘর্ষের দিনে আমরা উভয়ের সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। মার্ক্সবাদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সত্য রয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন সত্যের মিলনের উপরেই চারণ-আন্দোলনের ভিত্তি। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের আদর্শের মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের আজ একান্তই প্রয়োজন আছে।

চারণ-আন্দোলনের আর একটা সার্থকতা রয়েছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যুগ-সত্যগুলিকে জন-সাধারণের কাছে প্রচার করবার মধ্যে। রাজপুতানার চারণেরা একদিন গান দিয়ে যে শৌর্য্যের আগুন জ্বালিয়েছিলো অন্তরে অন্তরে, সেই শৌর্য্যের আগুন আমরাও জ্বালাতে চাই অবসন্ন দেশের শিরায় শিরায়। গান না হ'লে প্রাণ জাগে না। গানকে আশ্রয় ক'রে আমরা স্বাদেশিকতার ও শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে ছড়িয়ে দেবো দিগ্‌দিগন্তরে। গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতের সাহায্যে সোস্যালিজ্‌মের আদর্শকে প্রচার করবার এই কাজে আর কোনো রাজনৈতিক দল ব্রতী হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। তারপর 'মিলিশিয়া' গঠনের ব্যাপারেও চারণদল আপনার অস্তিত্বের সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করেছে। আমাদের ইউনিফর্ম, আমাদের অভিবাদনের কায়দা—সবকিছুই একটা সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করবার সংকল্প নিয়ে। এই সংকল্প ইতিমধ্যেই সাধনার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। আমাদের সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আর কোন্ দল এই 'মিলিশিয়া' গঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে? তারপর সোস্যালিজ্‌মের আদর্শ এবং কর্ম্মপন্থাকে এমন অল্প কথার মধ্যে গুছিয়ে সুস্পষ্টভাষায় প্রকাশ করবার যে প্রতীক চারণদল গ্রহণ করেছে—তার মধ্যেও কি নূতনত্ব নেই? আমাদের বিশ্বাস চারণদলের অস্তিত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের এই ঘাত-প্রতিঘাতের দিনে। আমাদের এই স্বাতন্ত্র্য যেন উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য হ'য়ে অন্যকে আঘাত না করে।

পরিশেষে চারণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করার মধ্যে। জনসাধারণ তো শুকনো বারুদ হ'য়ে আছে। কোথায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যার ছোঁয়া লেগে বারুদের স্তূপ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠবে। তরুণের সবুজ প্রাণই হ'চ্চে সেই স্ফুলিঙ্গ। তাই দেশের যুবক যারা—তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার মধ্যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে সকলের আগের কাজ। লক্ষ্য আমাদের কি হওয়া উচিত এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে—তার কথা যুবকদের পরিষ্কার ক'রে জানা চাই। চিন্তা যেখানে এলোমেলো, উচ্ছ্বাসের যেখানে প্রাচুর্য্য কিন্তু জ্ঞানের যেখানে দৈন্য, সেখানে আকাশকে চীৎকারে চীৎকারে আমরা যতই মুখরিত ক'রে তুলিনা কেন, লক্ষ্য থেকে যাবে সুদূরে। চারণদল তাই তো যুবকদের উন্মাদনাকে দাঁড় করাতে চায় একটা বৈজ্ঞানিক সত্য-দৃষ্টির উপরে। এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে চারণ-আন্দোলন হচ্ছে বিশেষ ক'রে যুবআন্দোলন—যদিও যুব-সমাজের মধ্যেই তার অস্তিত্ব একান্তভাবে সীমাবদ্ধ নয়। যা সত্য—তারই সঙ্গে যুবকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চারণ-আন্দোলন তাদের টেনে আনতে চায় খামারে, খনিতে আর কারখানায় গণ-ঐরাবৎকে চালাবার জন্য। তরুণেরা যেখানে নিদ্রিত— সর্ব্বহারাদের মুক্তি সেখানে অসম্ভব। রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হাতে নেবার জন্য দলাদলির মধ্যে

জড়িয়ে পড়ার চেয়ে দেশের তরুণদের মনে সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়ে দেওয়াকে আমরা, তাই, অধিকতর মূল্যবান কাজ বলে মনে করি।

আসুন, সকলে দলে দলে যোগ দিয়ে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করি। রাজনৈতিক আকাশে ঝড় উঠেছে আজ। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার দিন এসেছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে সুরু হয়েছে গণ-আন্দোলনের ভূমিকম্প। ভারতবর্ষ আজ দ্রুতবেগে জন্ম নিতে চলেছে একটা বিরাট ঐক্যের মধ্যে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে যৌবন-জল-তরঙ্গে আমরা জয় মা ব'লে ভাসিয়ে দিলাম আমাদের নব-আন্দোলনের তরণীখানিকে। জয় হোক।

চারণের

প্রতিজ্ঞা-পত্র

১। অদ্য হইতে পৃথিবীতে শ্রেণীহীন-সমাজ-প্রতিষ্ঠাই (Classical Society) আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইল।

২। আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধনই (Expropriation) এই মহান আদর্শে উপনীত হইবার অপরিহার্য্য পন্থা।

৩। আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধনের জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান (Overthrow Of The Capitalist State) সর্ব্বাগ্রে করণীয়।

৪। আমি বিশ্বাস করি, জনসাধারণ কর্ত্তৃক অহিংস-আইন-অমান্য-আন্দোলন আশ্রয়-গ্রহণই (Civil Disobedience) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

৫। আমি বিশ্বাস করি, গণ-সংগঠনই (Organised Labour) এইরূপ আন্দোলন সৃষ্টির একমাত্র সোপান।

চারণের করণীয়

(১) আপনার দেহকে সুগঠিত এবং সবল করিয়া গড়িবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিব।

(২) সর্ব্বদার জন্য মাথা উঁচু করিয়া চলিব, মেরুদণ্ড খাড়া রাখিয়া বসিব।

(৩) কথা বলিবার সময় অপরের চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিব।

(৪) বাক্যে সংযমী হইব। যে কথার মূল্য আছে, মাত্র তাহাই বলিব।

(৫) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।

(৬) সামাজিক ব্যবস্থার দোষে যাহারা আজও নিরক্ষর, দরিদ্র অথবা অস্পৃশ্য হইয়া আছে—তাহাদের সঙ্গে সম-আসনে বসিব এবং উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি যেমন শিষ্টাচার প্রদর্শন করি, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ করিব।

(৭) সময়ানুবর্তী হইব। জীবনের প্রাত্যহিক কাজগুলি যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিব।

(৮) কোন চারণের আচরণের ত্রুটী দেখিলে সেই ত্রুটীর প্রতিকুল সমালোচনা তাহার অসাক্ষাতে না করিয়া সোজাসুজি তাহাকেই বলিব। প্রয়োজন হইলে সর্দ্দারকে জানাইব।

(৯) নিজেকে, নিজের বাসস্থানকে, নিজের গ্রামকে এবং নিজের আবেষ্টনীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

(১০) চারণের বিপদের কথা শুনিলে অনতিবিলম্বে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইব। তাহার সুখকে নিজের সুখ এবং তাহার বেদনাকে নিজের বেদনা বলিয়া জ্ঞান করিব।

(১১) জীবনের কোন আচরণে কোনপ্রকার মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিব না।

(১২) সকলের সঙ্গে সর্ব্বদার জন্য মৈত্রীভাব পোষণ করিব।

(১৩) শ্রেণীহীন-সমাজ-প্রতিষ্ঠার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য জীবন ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিব।

পরিশিষ্ট - ৭

আমরা যাহা বিশ্বাস করি

রেজাউল করীম
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা— সে হচ্ছে পশুর ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্ম আলাদা। মানুষ কেবল বেঁচে থাকতে চায়না— সে চায় একটা কিছুর জন্য বাঁচ্‌তে। তার জীবন চায় এমন একটা আদর্শ যার জন্য সে সহস্র জন্ম হাসিমুখে উৎসর্গ করতে পারে।

যত আদর্শ আছে তার মধ্যে, বোধ হয়, প্রেমের আদর্শই মানুষের চিত্তকে নাড়া দিয়েছে সব চেয়ে বেশী ক'রে। 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'— যুগে যুগে এই প্রার্থনাই মানুষের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে। কেন? কারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বারম্বার দেখেছে, ছোটো ছোটো বাসনার গণ্ডীর মধ্যে আপনার সত্ত্বাকে বন্দী ক'রে রাখায় দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। সুখ বহু মানবের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়ায়, আনন্দ সকলের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলায়। মানুষ যেখানে আপনাকে ভুলতে পেরেছে কোনো বৃহৎ আদর্শের ডাকে সেখানে সে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে।

যে মানুষ সকলের মধ্যে আপনার চেতনাকে ব্যাপ্ত ক'রে দিতে পেরেছে, প্রেমে যে মানুষ সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তার প্রাণ দেবালয়ের নির্জ্জন কোণে বৈকুণ্ঠের রাস্তাকে অন্বেষণ ক'রে তৃপ্তি পায়নি, সাহিত্যের মর্ম্মর-মীনারে সুন্দরের পূজাতেও মগ্ন থাকতে পারেনি। মাতৃকোলে যেখানে যত শিশু কেঁদেছে ক্ষুধার দুঃসহ যাতনায় তাদের সকলের কান্না তার মর্ম্মে করেছে প্রবেশ— লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষের দুঃখকে তার নিজের দুঃখ ব'লে মনে হয়েছে। কোটী কোটী মানুষ যদি আজীবন জীবন্ত নরকঙ্কাল হ'য়ে থাকে—স্বর্গে তাহ'লে কি প্রয়োজন? মুক্তিতেই বা কি লাভ? মানুষের জ্ঞানের রাস্তাকে প্রসারিত করবারই বা কি সার্থকতা? সহস্র সহস্র মানুষ যদি অন্ন না পেলো, জ্ঞান না পেলো, সংস্কৃতি থেকে, আনন্দ থেকে আজীবন বঞ্চিত হ'য়ে রইলো—তবে দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের মধ্যে হৃদয়বান মানুষ কি সুখে বাঁচতে চাইবে? এই যে ভালোবাসার গভীর অনুভূতি— এই অনুভূতিই মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে মানুষের সেবায় আপনাকে

উৎসর্গ করতে। ভালোবেসেই বিবেকানন্দ বললেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" ভালোবেসেই রল্যাঁ লিখলেন,

> If any man would see the living god face to face, he must seek him, not in the empty firmament of his own brain, but in the love of men.

ভগবানকে যে চোখের সামনে মূর্ত্ত দেখতে চায় সে তাঁকে কোথায় খুঁজবে?

> নয়কো বনে, নয় বিজনে,
> নয়কো আমার আপন মনে,
> সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

মানুষের ভালোবাসার মধ্যে ভগবানকে যে পেলো না সে তাঁকে কোথাও পাবে না। ভালোবেসেই রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

> "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
> সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
> সবার পিছে, সবার নিচে,
> সবহারাদের মাঝে।"

বড়ো বড়ো কলকারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সেই সব অট্টালিকায় বহুবিধ উপকরণের প্রাচুর্য্য, প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর বন্দর, ইস্কুল আর কলেজ, টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ী আর ইষ্টিমার, নানা রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সভ্যতার এই বিচিত্র উপাদানগুলি বঙ্কিমের চিত্তকে যে উল্লসিত করতে পারেনি—তারও কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা কৃষককে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

তাদের কথা ভেবেই দেশকে তিনি প্রশ্ন করলেন,

> "এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটী কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালিপায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটী অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে। উঁহাদের মঙ্গল হইয়াছে?"

দেশের কোটী কোটী নিরন্ন হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের মধ্যে বঙ্কিমের চেতনা ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল ব'লেই রেলগাড়ী আর টেলিগ্রাফ, হাঁসপাতাল আর ছাপাখানা, দূরবীণ আর গ্যাসের আলো, পাহারাওয়ালা আর নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যর মাপকাঠি দিয়ে—দেশের কতখানি মঙ্গল হয়েছে—তার বিচার তিনি করলেন না।

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর এক লক্ষণের কথা বলেছেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলছেন—"প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।" গৌরদাস বাবাজী এবং সত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুটো বিভিন্ন দিকের কথা বলেছেন—একজন বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার কথা, আর একজন দুষ্টকে দমন করবার কথা। বৈষ্ণবের এই যে দুটো বৈশিষ্ট্য—আসলে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যে মানুষকে ভালোবাসে সে-ই দুষ্টকে দমন করতে অগ্রসর হয়। উৎপীড়িতের হাহাকার তার চিত্তকে বিচলিত করে এবং সেই জন্য অন্যায়কারীকে বাধা না দিয়ে সে থাকতে পারে না। মানুষকে যে ভালোবাসে না চোখের সামনে অন্যায় দেখেও সে উদাসীন থাকে। আসল বৈষ্ণব তো সেই একদিকে যে পুষ্পের মতো কোমল এবং আর একদিকে বজ্রসম কঠিন। মার্ক্স আর লেনিন, তিলক আর গান্ধী, ক্রোপট্কিন আর জওহরলাল—জগতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর প্রতি অপরিমেয় সমবেদনাই এঁদের সবাইকে বিপ্লবের পথে টেনে এনেছে। ওয়েব্ (Webb) দম্পতী তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ "Soviet Communism" এ ঠিকই লিখেছেন,—

> 'What moved Karl Marx to lifetime of political conspiracy and economic study in grinding poverty–What steeled the will to revolution of Lenin and his companions–was the misery and incompleteness of life that contemporary economic conditions everywhere inflicted on the mass of the population.'

> "সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনসাধারণের জীবনকে দারিদ্র্যের মধ্যে পঙ্গু ক'রে রেখেছিলো। তাদের সেই অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ কার্ল মার্ক্সকে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেও আজীবন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং অর্থনীতির গবেষণায় ব্রতী থাকতে প্রেরণা দিয়েছিলো, লেনিন এবং তাঁর সহচরগণের বিপ্লব সৃষ্টির সংকল্পকে দৃঢ়তা দান করেছিলো।"

জীবনের সায়াহ্নে চিত্ত যখন স্বভাবতই শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্রাম কামনা করে তখনও যে গান্ধী সত্যাগ্রহ পরিচালিত করবার দায়িত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন—হাতে পাঞ্চজন্য তুলে নিতে অস্বীকার করলেন না— সেও তো প্রেমেরই ডাকে। স্বাধীনতা চাই ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার যে সৌভাগ্য তার অধিকারী করবার জন্য। তাদের বাদ দিয়ে বেঁচে থাকবার কি কোনো প্রয়োজন আছে? গান্ধী বললেন,

"আমার সত্বার প্রতি অণু-পরমাণুতে আমি জনসাধারণেরই একজন। তাদের বাদ দিলে আমার কিছুই থাকে না। তাদের অস্বীকার ক'রে আমি বেঁচে থাকতে চাইনে।"

এই যে সর্ব্বব্যাপী প্রেম—এর চেয়ে বিশালতর আর কোনো বড়ো আদর্শের কল্পনা কি আমরা করতে পারি? সক্রেটিসই বলি আর খৃষ্টই বলি, লেনিনই বলি আর গান্ধীই বলি—সকলেরই বাণীর মর্ম্ম হচ্ছে প্রেম—মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের প্রেম, জাতির প্রতি জাতির প্রেম। আমরা চারণেরা এই প্রেমের আদর্শকেই জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছি এবং সেই জন্যই শ্রেণীহীন সমাজের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ আমাদের অন্তরে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। এই শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সাম্যের ভিত্তির উপরে। সেই আদর্শ-সমাজে মগজের দ্বারাই হোক আর হাতের দ্বারাই হোক, সমাজ-সেবার দায়িত্বই হবে প্রত্যেকটী নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব। শিশু, রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ ছাড়া কর্ম্ম সবাইকেই করতে হবে। আমি সমাজে আছি—শুধু এই কারণেই তো সমাজ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নিতে পারে না। I must pay my way by what I do. সমাজের সেবার জন্য কাজ যে করবে না সেই নিষ্কর্ম্মার অপদার্থ জীবনকে সবাই কৃপার চোখে দেখবে। গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজেও—

> Every body contributes his or her due quota to the common goal.
>
> সমষ্টির কল্যাণের বেদীমূলে প্রত্যেকের যা দেবার আছে তা উৎসর্গ করতে হবে।

চরকার গুঞ্জনের মধ্যে তা কর্ম্মবাদেরই জয়গান। শ্রেণীহীন সমাজে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে লাভের জন্য মজুররূপে ব্যবহার করতে পারবে না— কোনো শ্রমিকও উদরান্নের জন্য তার দক্ষিণ হস্তকে অন্যের কাছে, যত অল্প পারিশ্রমিকেই হোক, বিক্রয় করতে বাধ্য হবে না। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়েব দম্পতী সোভিয়েট কমিউনিজমের (Soviet Communism) দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন,

> "The aim was an equalitarian society where health and economic security, education and culture, manners and refinement would be, in the absence of any privileged class, or any privileged race, substantially common to all, because effectively open to all. Nothing less than this creation of a new and unprecedented social order is the Bolshevist aim." p.1020.
>
> "উদ্দেশ্য ছিলো সাম্যে প্রতিষ্ঠিত এমন একটা সমাজ গঠন করা যেখানে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, শালীনতা এবং ভব্যতা—এসবের মোটামুটি অধিকারী হবে সবাই, কারণ সেই সমাজে এসকলের পথ সবার

কাজেই উন্মুক্ত থাকবে, সুবিধাভোগী শ্রেণী বা সম্প্রদায় ব'লে কিছু থাকবে না। এই যে অভিনব এবং অপূর্ব্ব সমাজ-ব্যবস্থা—একে সৃষ্টি করাই হচ্ছে বলশেভিকদের লক্ষ্য।"

গান্ধীজীর স্বরাজেও দেখতে পাচ্ছি,

"–all can read and write, and their knowledge keeps growing from day to day. Sickness and disease are reduced to the minimum. No one is pauper and labour can always find employment. It should not happen that a handful of rich people should live in jewelled palaces and millions in miserable hovels devoid of sunlight or ventilation."

মার্ক্সের শ্রেণীহীন সমাজ আর গান্ধীর স্বরাজ—দু'য়েরই আদর্শ হচ্ছে সার্ব্বজনীন কল্যাণের আদর্শ—প্রত্যেকটী মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের আদর্শ। শ্রেণীহীন সমাজে অথবা স্বরাজে অসুস্থ অথবা অশিক্ষিত লোক থাকবেনা বল্লেই চলে। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানের সম্পদ সকলেরই অধিকারের মধ্যে আসবে। সেখানে বেকার-সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যাই থাকবে না, মুষ্টিমেয় ধনীর অট্টালিকার পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আলোহীন বায়ুশূন্য স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বাস করছে—এমন দৃশ্য কারও চোখে পড়বে না। 'মনোপলি'র উপরে মার্ক্সের যেমন ঘৃণা গান্ধীরও তেমনি ঘৃণা। গান্ধী বলেন,

"I hate privilege and monopoly. Whatever cannot be shared with the masses is taboo to me."

"সবাইকে বঞ্চিত ক'রে সব সুবিধাভোগকে নিজের জন্য একচেটিয়া করে রাখাকে আমি ঘৃণা করি। সবার সঙ্গে ভাগে যা ভোগ করা সম্ভব নয় আমার কাছে তা বর্জ্জনীয়।"

স্বরাজের আর শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি তা'হলে প্রেমে। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নন্‌ভায়োলেন্স—প্রেম।

"The world of to-morrow as I see it will be, must be, a society based on non-violence. That is the first law, for it is out of that law that all other blessings will follow."

– Gandhi

"ভাবী জগত আমার কাছে যে রূপ নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে সেখানে সমাজের ভিত্তি হবে প্রেম। এই প্রেমই হচ্ছে সেখানকার মূল নীতি— কারণ এই প্রেমকে আশ্রয় করেই আর সব কল্যাণের আর্বিভাব হবে।"

—গান্ধী

শ্রেণীহীন সমাজে জোরের প্রতীক রাষ্ট্র আপনার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছে। সেখানে নাগরিকগণকে দমন করবার জন্য পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আর কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'লে মানুষ সমাজের মঙ্গলকে আঘাত করা তো দূরের কথা—তাকে পুষ্ট করবার জন্য অনুপ্রাণিত হয় সেই শুভবুদ্ধির আলোকে শ্রেণীহীন সমাজের লোকেরা আপনাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে অভ্যস্ত হয়েছে। মানুষ যেখানে আপনার অন্তরের আলোয় কল্যাণের পথে চলবার সৌভাগ্য লাভ করেছে— সেখানে লগুড়ধারী পুলিশের আর তো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। নৈতিক অপরাধ অবশ্য কিছু কিছু ঘটবেই কিন্তু তার প্রতীকারের জন্য এখন যে সব নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বিত হয়, শ্রেণীহীন সমাজে সে সব পন্থা বর্ব্বরতা ব'লে পরিত্যক্ত হবে। আমরা জানি গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজেও সৈনিকের সঙ্গীনের কোনো স্থান নেই। পুলিশ থাকবে কিন্তু তার কাজ হবে দমন করা নয়—নতুন মানব-সমাজ গ'ড়ে তোলায় সাহায্য করা। পুলিশ হবে রিফর্ম্মার অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারক। আমরা মার্ক্সের পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজের আদর্শের বিশেষ কোনো তফাৎ দেখি না। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই সাম্যের ভিত্তিতে। ভোট পর্য্যন্ত এসে সেখানে গণতন্ত্রের দৌড় ফুরিয়ে যায়নি, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সেখানে অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বৃহত্তর পরিণতি লাভ করেছে, জমি, খনি, কলকারখানার উপরে ব্যক্তির অবাধ অধিকারের পরিবর্তে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

—সুতরাং ধনী আর দরিদ্র ব'লে সেখানে পৃথক দুটী শ্রেণী আর নেই। ' শ্রেণীহীন সমাজ' কথাটীর মধ্যে সাম্যের অর্থনৈতিক দিকটার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি হয়েছে বলে Classless Society—এই শব্দটীকে চারণেরা তাদের আদর্শ বুঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছে। এ হ'চ্ছে এমন একটা জ্যোর্তিশ্ময় আদর্শ যার জন্য সহস্র জীবন অনায়াসে বাঁচতে পারা যায়—যার জন্য সহস্র মরণও হাসিমুখে বরণ করা চলে। এই আদর্শের মধ্যে উড্ডীন রয়েছে প্রেমের জয়ধ্বজা। পৃথিবীর অগণিত শৃঙ্খলিত মানুষকে যারা মুক্ত করতে চেয়েছে দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, নৈতিক অধঃপতন থেকে, যারা গড়তে চেয়েছে একটা নূতন পৃথিবী যার তোরণ-দ্বারে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—তারাই শুধু এই আদর্শের বেদীমূলে জীবনকে উৎসর্গ করবার প্রেরণা লাভ করেছে।

> "There must be expropriation. The well-being of all–the end; expropriation–the means." (Kropotkin)

আমরা বিশ্বাস করি শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে বাস্তবে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে অপরিহার্য্য পন্থা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, নীতির

দিক দিয়ে, জ্ঞানের দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে প্রতিটী মানুষকে যদি আমরা উন্নত দেখতে চাই তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে দারিদ্র্যকে প্রাচুর্য্যে রূপান্তরিত করা এবং সম্পদের সেই প্রাচুর্য্যের যাতে সবাই অধিকারী হয় তার জন্য যত্নবান হওয়া। ঠাকুর বলতেন, 'খালি পেটে কখনো ধর্ম হয় না।'

যেখানে ক্ষুধার আগুন সেখানে ভগবানের কথা কানে ঢোকে না। দারিদ্র্য আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে যে ভেঙে দেয়—এ বিষয়েও কি কোনো সন্দেহ আছে? আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের কুৎসিত পরিবেষ্টনীই আমাদিগকে দুর্নীতির পথে নিক্ষেপ করে। এই কথাটাকেই Dr. Stockmann-এর মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে ইব্‌সেন লিখেছেন,

> "In a house which does not get aired and swept every day–my wife Katherine maintains that the floor ought to be scrubbed as well, but it is a debatable question–in such a house, people will lose within two or three years the power of thinking or acting morally. Lack of oxygen weakens the conscience."

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেখানে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে প্রাণান্ত হতে হয় সেখানে বড়ো কিছু ভাববার মতো উদ্যম আর অবশিষ্ট থাকে না। সাহস এবং কল্পনাশক্তিকে আশ্রয় ক'রে সমাজব্যবস্থাকে যদি আমরা এমন ভাবে গড়তে পারি যে কোন মানুষ খাওয়া পরার ও থাকার অভাব অনুভব করবে না, তবেই মানুষের মন মুক্তি পাবে বড় বড় ভাবনা ভাবার জন্য।

সমাজনীতিই বল আর রাজনীতিই বল—অর্থনীতি হোলো উভয়ের গোড়ার কথা। আগে প্রত্যেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা চাই। মানুষের অন্নের সমস্যাকে অবহেলা ক'রে যা কিছু গড়তে যাবো কিছুই জোরালো হবে না—সবই হবে ঘূণ-ধরা। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন সেখানে ধর্ম্ম বল, নীতি বল, সাহিত্য বল—কোন কিছুই খাঁটি হতে পারে না। সুতরাং মার্ক্সবাদীই হোক আর গান্ধীবাদীই হোক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন—মানুষকে আগে অন্ন দিতে হবে—তারপরে অন্য কথা। বাঁচলে তবে ধর্ম্মকর্ম্ম সব কিছু। জাহাজ যেখানে ডুবছে সেখানে আমরা জীবন-তরীর ব্যবস্থা করি; ঘরে যখন আগুন লাগে আমরা আগুন নেবানোর জন্য কম্বলের শরণ নিই; একটা জাতের শতকরা নব্বুই জন লোক যখন অনশনে জীবন কাটায় তখন তাদের জন্য সর্ব্বাগ্রে কাজের এবং অন্নের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। এর মধ্যে তর্কের কোনো স্থান নেই। কোটী কোটী ক্ষুধিত নরনারীর জন্য যতদিন আমরা অন্নের ব্যবস্থা না করতে পারছি ততদিন শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন স্বপ্ন হ'য়েই থাকবে। কমিউনিষ্ট, এ্যানার্কিষ্ট অথবা গান্ধীবাদীরা ডাল-ভাতের উপরে এতখানি জোর দিচ্ছে

ব'লে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ডাল-ভাতের বাইরে মানুষের আর কোনো প্রয়োজনকে তারা স্বীকার করে না। তারা ভালো ক'রেই জানে যে খাওয়া-পরার আনন্দের বাইরে উচ্চতর আনন্দ আছে—বিজ্ঞানের আনন্দ, আর্টের আনন্দ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ, সুন্দরকে সৃষ্টি করার আনন্দ। এই উচ্চতর আনন্দের অধিকারী এখন ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় নরনারী—যদিও সবাইকে এই আনন্দের অধিকারী করা একেবারেই অসম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদরান্নের জন্য উদয়াস্ত এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যে আর্টের আনন্দকে, বিজ্ঞানের আনন্দকে উপভোগ করবার মতো তাদের সময়ও নেই, মনের শক্তিও নেই। কমিউনিষ্টরা অথবা গান্ধীবাদীরা প্রত্যেকটী মানুষকে অন্ন-চিন্তা থেকে মুক্ত করতে চান যাতে সে জীবনের উচ্চতর আনন্দগুলিকে উপভোগ করবার অধিকারী হতে পারে।

আর একটা কথা। ব্যক্তি-বিশেষের অথবা সংঘ-বিশেষের বদান্যতাকে আশ্রয় ক'রে দয়া দিয়ে আমরা দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের অবসান ঘটাতে পারবো না। এরজন্য চাই বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। হাজার হাজার মানুষের নিজের বলতে এক ছটাকও জমি নেই। অথচ এক একজন মানুষ রয়েছে যারা একাই হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য যে এমন দুঃসহ তার কারণ নিজের বলতে একটুও জমি নেই তাদের। দেশব্যাপী দৈন্যের বিভীষিকা দূর করতে হ'লে এমন ব্যবস্থা করা চাই যাতে ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে যতটুকু জমির দরকার হয় তার চেয়ে বেশী জমির অধিকারী কেউ না হ'তে পারে। সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ অধিকার যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন কোটী কোটী মানুষ দরিদ্রই থেকে যাবে। এই জন্য মার্ক্সবাদী এবং গান্ধীবাদী উভয়েই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের এত পক্ষপাতী। কিছুকাল আগে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ রামগড় কংগ্রেসে উপস্থিত করবার জন্য গান্ধীজীর কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন,

> "The land laws of the country shall be drastically reformed on the principle that land shall belong to the actual cultivator alone, and that no cultivator should have more land than is necessary to support his family on a fair standard of living."

> "দেশের ভূমিসংক্রান্ত আইনের এমন ভাবে সংস্কার করতে হবে যে জমির মালিক হবে শুধু চাষী এবং স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালনের জন্য যতটা জমির দরকার তার বেশী জমি কেউ পাবে না।"

জয়প্রকাশের এই প্রস্তাবের উপরে মন্তব্য ক'রে গান্ধীজী লিখেছেন,

> 'Sri Joyprokasha's propositions about land may appear frightful. In reality they are not. No man should have more land than he needs for dignified sustenance. Who can dispute

the fact that the grinding poverty of the masses is due to their having no land that they can call their own?"

(Harijan. 20.4.40.)

"শ্রীজয়প্রকাশের ভূমিসংক্রান্ত প্রস্তাব ভীতিপ্রদ মনে হ'তে পারে। আসলে কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষের গরিমা নিয়ে বাঁচবার জন্য যতখানি জমি থাকা প্রয়োজন তার বেশী কারও জমি থাকা উচিত নয়। জনসাধারণের প্রাণান্তকর দারিদ্র্যের কারণই হচ্ছে তাদের আপনার বলতে ভুঁই এতটুকুও নেই। এই অবিসম্বাদী সত্যকে অস্বীকার করবে কে?"

(হরিজন ২০.৪.৪০)

গান্ধীজী The World of To-morrow নামক প্রবন্ধেও এই কথাই লিখেছেন। সেখানে আছে:

"Equal distribution the second great law of the world of to morrow as I believe it will be–grows out of non-violence. The real implication of equal distribution is not an arbitrary dividing up of the goods of the world. It is that each man shall have the wherewithal to supply his natural needs and no more."

"ভাবী জগতের দ্বিতীয় মহাদর্শ হবে—সম্পদকে সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেওয়া। এই ব্যবস্থা নন্‌ভায়োলেন্সের মূলনীতি থেকেই উদ্ভূত হবে। সম্পদকে সকলের মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই নয় যে পৃথিবীর ধনরাশিকে সকলের মধ্যে যেমন-তেমন ক'রে ভাগ ক'রে দিতে হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন—প্রত্যেক মানুষ তা পাবেই—তার বেশী কিন্তু পাবে না।"

সম্পত্তি-ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তির অধিকারের যে একটা সীমা থাকা উচিত—এই কথাই গান্ধীজী স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেন। সামাজিক সম্পদের উপরে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার ক'রে নিলে ধনবৈষম্য অনিবার্য্য। একদল লোক ধনবৈষম্যের সুযোগ নিয়ে আর একদল লোককে শোষণ করবে আর শোষণ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। যে সমাজে একদল লোক দুধ-সর সবই ভোগ করছে এবং অপর একদল চাঁচি পর্য্যন্ত পাচ্ছে না সে সমাজের ভিত্তি প্রেমে নয়—লোভে। যেখানে প্রেম সেখানে আছে মনুষ্যমাত্রকেই আত্মবৎ দেখার উদারতা। সেখানে একদল মানুষ সব-কিছুই ভোগ করবে এবং আর একদল মানুষ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে—এমন ঘটতেই পারে না। এইজন্যই গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কার্য্য-তালিকার মধ্যে যেখানে Working for Economic Equality-র কথা আছে সেখানে বলছেন, সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সাধনাই হচ্ছে the master key to non-violent Independence. পুনরায় বলছেন,

> "A non-violent system of Government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists."
>
> "যতকাল পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত জনসাধারণ এবং মুষ্টিমেয় ধনকুবের—এই উভয়ের মধ্যে ধনগত বৈষম্যের ব্যবধান জাগ্রত হ'য়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা অসম্ভব।"

তারপরেই বলছেন :

> "The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class can not last one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land."
>
> "নয়াদিল্লীর প্রাসাদগুলির আর সর্ব্বহারা শ্রমিকদের কদর্য্য বাসস্থানের মধ্যে যে বৈষম্য—স্বাধীন ভারতবর্ষ এই বৈষম্যকে একদিনের জন্যও বরদাস্ত করবে না। স্বাধীন ভারতে দেশের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি যে ক্ষমতা ভোগ করবে—গরীবও সেই অধিকারই ভোগ করবে।"

যোল আনা অহিংসাবাদী হ'তে গেলে কোন ক্ষেত্রেই শোষণকে বরদাস্ত করা চলবে না। যে সমাজে ধনবৈষম্যের আধিপত্য তাকে স্বীকার ক'রে নিলে হিংসাকেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। যিনি সত্যিকারের অহিংসবাদী তিনি এমন একটা জগতকে সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম করবেন যেখানে প্রত্যেকটী মানুষের জীবনই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ। যে জগতে শোষণ নেই সেখানেই শুধু মানুষের এই জ্যোতির্ম্ময় আত্মপ্রকাশ সম্ভব।

সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অবাধ অধিকারকে একবার স্বীকার ক'রে নিলে সর্ব্বহারারা কোনো দিনই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না। সুতরাং আমরা চারণেরা বিশ্বাস করি যে কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অনিবার্য্য। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় মানুষ জমির উপরে, খনির উপরে, কলকারখানার উপরে যে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছে—হঠাৎ সে অধিকার সে ত্যাগ করবে কেন? নিজের স্বার্থ মানুষ সহজে ত্যাগ করতে চায় না। বাপ-ঠাকুরদা জমিদারী ক'রে গেছেন—সেই জমির খাজনায় বিনা পরিশ্রমে দিন চলে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে। হঠাৎ তার উপরে অধিকার ছেড়ে দিলে ব'সে ব'সে খাওয়ার সৌভাগ্য চিরতরে চ'লে যাবে। সেই সৌভাগ্য কি কেউ ইচ্ছা ক'রে ত্যাগ করতে চায়? সাম্যের আদর্শকে ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিতো তা হ'লে ইতিহাসে রক্তের গঙ্গা বইয়ে বিপ্লব বারে বারে ঘটতে পারতো না। নিরন্নের দল যতদিন পারে দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যকে নীরবে বহন ক'রে চলে। সে দুর্ভাগ্য যখন দুঃসহ

হ'য়ে ওঠে ধৈর্য্যের বাঁধ তখনই যায় ভেঙে। দিকে দিকে তখন রক্তকেতন উড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব আসে অন্যায়ের অবসান ঘটাতে—ন্যায়ের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মানব-চরিত্রের সনাতন দুর্ব্বলতা সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তে পারি যে ধনীরা স্বেচ্ছায় তাদের স্বার্থকে পরিত্যাগ করবে না! জমি, খনি, কলকারখানাকে রাষ্ট্রের সাহায্যে ছিনিয়ে নিতে হবে তাদের অধিকার থেকে। এই ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাকে কমিউনিষ্ট এবং এ্যানার্কিষ্টদের ভাষায় expropriation বলা হ'য়ে থাকে। আমরা চারণেরা শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শে পৌঁছানোর জন্য expropriation-কে অপরিহার্য্য পন্থা ব'লে বিশ্বাস ক'রে থাকি।

কিন্তু expropriation-এর ব্যাপারটা একেবারেই সোজা নয়। রাষ্ট্র ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হচ্ছে লক্ষ্মীর বরপুত্রের দল। টাকা বিলিয়ে দেবার জন্য তারা তো বিষয় করেনি। বিষয় তাদের রক্ষা করতে হবে। চারিদিকে সহস্র সহস্র বুভূক্ষু মানুষ যাদের ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা এবং দক্ষিণবাহু ছাড়া আপনার বলতে আর কিছু নেই। এরা যদি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষেপে গিয়ে জমি-খনি-কলকারখানা সব অধিকার ক'রে বসে তবে তো সর্ব্বনাশ! সিগার ফুঁকে, শ্যাম্পেন খেয়ে, মোটরে চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবার দিন এক নিমেষে ফুরিয়ে যাবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বিষয়-রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ধনীরা রাষ্ট্রকে খাড়া করেছে আর এই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটীর বৈশিষ্ট্য যে কোথায় তা আমরা ভালো ক'রেই জানি। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মৃত্যুর শাসনকে অবিচলিত রাখবার জন্য তার দমন করবার ক্ষমতায়। ধনীরা যে সমাজব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চায় পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ব'সে ব'সে খাবার জন্য—তার নড়-চড় করতে গেলেই রাষ্ট্রের মুদগর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পড়বে। বস্তুত: ধনীদের বিষয় রক্ষার জন্য মুদগর চালানোই হ'চ্ছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র— রেগুলেশন লাঠি থেকে আরম্ভ ক'রে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত। একটু ট্যাঁফু করতে গেলেই রাষ্ট্র যে কী চিজ্ তা ধনীরা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। সর্ব্বহারারা যতক্ষণ ধনীদের বিষদাঁত রাষ্ট্রকে ওপ্‌ড়াতে না পারছে ততক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অসম্ভব। তারা দারিদ্র্যের যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে এবং ধনীরা ঐশ্বর্য্যের যে শিখরে বসবাস করছে সেই শিখরেই পুরুষানুক্রমে বসবাস করতে থাকবে। অতএব জমি, খনি এবং করকারখানার উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের যে অবাধ অধিকার রয়েছে তার অবসান ঘটাতে হলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন চাই সর্ব্বপ্রথমে। রাষ্ট্রশক্তিকে জয় করবার আগেই যারা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে বড্ড বেশী হৈ চৈ করে তারা রাজনীতির সঙ্গে

অর্থনীতির কি নিগূঢ় সম্পর্ক তা ভালো ক'রে জানে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা ক'রে যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর অত্যন্ত বেশী জোর দেয় তারা গাড়ীকে রাখে ঘোড়ার আগে। আমাদের বামপন্থী সোস্যালিষ্ট বন্ধুরা এ বিষয়ে যদি একটু সচেতন হন। যা আগের কাজ তা আমাদের আগেই করতে হবে, যা পরের কাজ তা পরে। আগে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা—পরে আসবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন।

কিন্তু সর্ব্বহারারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাবে কেমন ক'রে? রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে প্রচণ্ড হাতিয়ার। তাদের তো কোন হাতিয়ার নেই—যা আছে তা দিয়ে দমদম বুলেটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্যস্থানে বোমা ফেলতে হ'লে অনেক দিনের শিক্ষা চাই। সে শিক্ষাই বা তাদের কোথায় আর সেই হাতিয়ারই বা তাদের কোথায়? হাতিয়ারকে সহায় ক'রে আধুনিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটানো এক রকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মাণীতে এবং ইটালিতে কমিউনিষ্টরা পারলে না হিটলারের আর মুসোলিনীর শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করতে। গোটাকতক রিভলবার দিয়ে তো আর হাজার হাজার ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেনের পাল্লা দেওয়া চলে না। এর উপরে রয়েছে গুপ্তচরের অভিশাপ— টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, দ্রুতগামী মোটরকার ইত্যাদি নিয়ে এরা রাষ্ট্রের শত শত বিনিদ্র চক্ষুর মতো জেগে আছে। তাদের শ্যেনদৃষ্টিকে এড়িয়ে গোপনে গোপনে বিপ্লবসৃষ্টির আয়োজন করা কঠিন ব্যাপার। এজন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটানোর আশা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মন্দিরে পৌঁছানোর অন্য রাস্তা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। ভোটের জোরে পার্লামেন্ট দখল ক'রে আইনের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রমশঃ উচ্ছেদ সাধনের পরামর্শ কেউ কেউ দেন বটে—কিন্তু আমরা জানি সে পথে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারবো না। আবেদন-নিবেদনের পথের কথা তো উঠতেই পারে না। কাঁসার টাকার মতো তা একেবারেই অব্যবহার্য্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধনের কেবল একটা পথ খোলা আছে আর সে পথ হচ্ছে সত্যাগ্রহের ভীষণ-সুন্দর পথ। আমরা প্রাণের ভয়ে, সম্পত্তি হারানোর ভয়ে শক্তির ঔদ্ধত্যকে প্রতিদিন স্বীকার ক'রে চলি। যদি হাজার হাজার লোক সেই ঔদ্ধত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে সম্মত না হয় তা হ'লে অন্যায়ের শাসন ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। অত্যাচারীর শাসন-দণ্ডকে স্বীকার ক'রে না নিলে ক্ষতি অনিবার্য্য—প্রাণের দিক দিয়ে এবং বিষয়ের দিক দিয়ে—দু'দিক দিয়েই ক্ষতির সম্ভাবনা। সেই ক্ষতিকে স্বীকার ক'রে নিতে গেলে বুকে চাই অপর্য্যাপ্ত সাহস। যেখানে হাজার হাজার মানুষ এই সাহসের অধিকারী হয়েছে সেখানে অন্যায় টিকতে পারে না, অত্যাচারীর সমস্ত শক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। এইজন্যই গান্ধী বলেছেন—

"Cowardice should have no place in the national dictionary."

"জাতীয় জীবনের অভিধানে ভীরুতা ব'লে কোনো শব্দ থাকবে না।"

দেশে ভীরুতা থাকতে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় অসম্ভব। বীর হ'তে হবে—সত্য ব'লে যা বিশ্বাস করি জীবনে তার জয়ধ্বজাকে উড্ডীন রাখবার জন্য সর্ব্বদুঃখকে বরণ করতে হবে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের মধ্যে এই বীর্য্যের কঠিন মন্ত্র। তিনি আমাদের হাতে দিয়েছেন মৃত্যুর অস্ত্র। এ অস্ত্রকে যে দেশ ব্যবহার করতে শিখেছে সে দেশে অত্যাচার একদিনের জন্যও টিঁকতে পারে না। চারণেরা এই civil disobedience-কে স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্রহ্মাস্ত্র ব'লে বিশ্বাস করে। ও দেশের অলডাস্ হাক্সলির কণ্ঠেও এই civil disobedience এর জয়গান।

"The only methods by which a people can protect itself against the tyranny of rulers possessing a modern police force are the non-violent methods of massive non-co-operation and civil disobedience." (Ends and Means. p. 155)

"আধুনিক পুলিশবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত শাসকদের নির্য্যাতন থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থা হচ্ছে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অহিংসার পথে অসহযোগের এবং আইন-অমান্যের বিপুল অয়োজন।"

দু'একজন অথবা দু'দশ জনের civil disobedience দেশে একটা নৈতিক সাড়া জাগালেও স্বাধীনতা পেতে গেলে হাজার হাজার মানুষের বীর্য্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যের ভিতর দিয়ে গান্ধীজী জনসাধারণের হৃদয় দেশের জন্য আত্মদানের উন্মাদনা জাগাতে চান। চরকার পিছনে যদি বীরের প্রাণ না থাকে— তার দ্বারা আমরা একটুও লাভবান হবোনা—এই কথাই গান্ধীজীর কথা। মরণ-ভীরু ক্লীবের হাতে চরকা মকদ্দমাবাজ বিষয়ীর হাতে জপের মালার মতোই বিসদৃশ। গান্ধীজীর সব চেয়ে বিতৃষ্ণা ভীরুতার উপরে, দুর্ব্বলতার উপরে। চরকা যদি দেশ থেকে এই দুর্ব্বলতা দূর না করতে পারে গান্ধীজীর কাছে তার প্রয়োজন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যার পিছনে বীর্য্য নেই তার মূল্য কি?

"We do not fight violence so much as weakness. Nothing is worthwhile unless it is strong, neither good nor evil"

–Rolland.

"আমাদের লড়াই হিংসার বিরুদ্ধে ততখানি নয় যতখানি দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে। যার মধ্যে শক্তি নেই— তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক—আমাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।"

(রল্যাঁ—গান্ধীর জীবন-চরিত)

সুতরাং সারা জাতকে সাহসী ক'রে তোলাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। ক্লীবের জাতকে বীরের জাতে রূপান্তরিত করবার সাধনাই হচ্ছে গান্ধীজীর সাধনা। এজন্য আমাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে দেশের হাজার হাজার মজুর আর কৃষককে। তারাই জাতির মেরুদণ্ড। তারা যেখানে বীর্য্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেখানে পরাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব।

আদর্শ যতই কল্যাণময় হোক কেবল নিজের জোরে কখনো তা জয়ী হতে পারে না। চারণের আদর্শও কেবল মহৎ ব'লেই যেন জয়ের আশা না করে। বন্দে মাতরমের মতো এমন একটা অদ্বিতীয় সঙ্গীত অনেকদিন ধ'রে আনন্দ মঠের পাতায় মৃত হ'য়ে ছিলো যাদুঘরের মমিদের মতো। সেই সঙ্গীত প্রাণ পেলো স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কর্ম্মবীরদের প্রাণের অগ্নিশিখা থেকে। দাবানলের মতো সেই গানের আগুন অগণিত হৃদয়ে ছড়িয়ে গেল। শ্রেণীহীন সমাজের বিরাট আদর্শকে সত্য হ'লে তাকে জনসাধারণের জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে হবে। জনসাধারণ সেই আদর্শকে অন্তরে যখন নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবে তখনই তা'র জয়যাত্রা হবে সুরু। আদর্শ বাস্তবে সত্য হ'য়ে উঠবার জন্য তাই কর্ম্মশক্তির অপেক্ষা করছে। নীরব সেবার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মনকে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার উপায় গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যতালিকার অনুসরণ। আমরা চারণেরা সেই কর্ম্মতালিকায় বিশ্বাস করি।

আমরা জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করি। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত একটা বিশিষ্টতা আছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার সাধনার উপলব্ধিতে, সত্যকে অকুতোভয়ে অনুসরণ করার দৃঢ়তায়, আড়ম্বরহীন সংযত জীবনের নির্ম্মলতায়। জাতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার ক'রে আমরা যদি জোর করে কোনো ধার-করা আদর্শকে দেশের উপরে চাপাতে যাই ব্যর্থকাম হবো নিশ্চয়ই। জনসাধারণের মনকে আমরা স্পর্শ করতে পারবো না। আমরা গান্ধীজীর জীবনে এবং বাণীতে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির গরিমাময় বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পেয়েছি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার বাণী যাঁর কণ্ঠে তিনি পেট্রিয়টিজ্‌মের দাবীকে কিন্তু অস্বীকার করেননি। ইংরেজী ভাষাকে এবং ইংরেজ জাতিকে তিনি ভালবাসেন কিন্তু সেই ভালোবাসা জ্ঞানে দীপ্ত এবং বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। তিনি ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হবার মর্য্যাদা দিতে একেবারেই রাজী নন। সে মর্য্যাদার অধিকারী শুধু আমাদের মাতৃভাষা। ইংরেজের কল্যাণ তিনি মনে প্রাণে কামনা করেন কিন্তু ভারতবর্ষের কল্যাণের দাবী সর্ব্বাগ্রে। খাদিশিল্পকে গড়তে গিয়ে যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করতে হয় তাতে গান্ধী পশ্চাতপদ নন। আমরা গান্ধীজীর মতোই দেশপ্রীতির এবং সার্ব্বলৌকিক প্রীতির কল্যাণময়

সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। মস্কো মানবসভ্যতাকে যা দান করেছে তার সম্পর্কে আমরা উদাসীন নই কিন্তু সেখান থেকে যা-কিছু আসবে তাকে নির্ব্বিচারে বেদবাক্য ব'লে মেনে নেওয়াকে গোঁড়ামি ব'লেই মনে ক'রে থাকি। দেশপ্রীতি এবং সার্ব্বলৌকিক প্রীতির একটাকে বেছে নিতে হবে—এ হচ্ছে গোঁড়ামির কথা। আমাদের দেশপ্রেম জ্ঞানে দীপ্ত হবে না গোড়ামিতে সঙ্কীর্ণ হবে—এইটাই হচ্ছে ভাববার কথা।

কুটিরশিল্প এবং যন্ত্রশিল্প—এ দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কথাকেও আমরা গোঁড়ামি ব'লে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি উভয়ের সমন্বয়ে। কুটিরশিল্পেরও প্রয়োজন আছে—যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। কারও প্রয়োজন অন্তহীন নয়। মুস্কিল হয় তখনই যখন আমরা একটা দিক লক্ষ্য ক'রে অনবরত সেইদিকে চলতে থাকি, একটা জায়গায় এসে থামা উচিত, একথা ভুলে যাই। থিয়োরীর ব্রহ্মদৈত্য কাঁধে চাপ্‌লে এমনই হয়। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়—কাকে কতখানি মূল্য দেওয়া উচিত সে-বোধ আর থাকে না। যন্ত্রশিল্পের সমর্থকেরা যখন কুটিরশিল্পকে হেসে উড়িয়ে দিতে যায় তখন বুদ্ধির দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনের সীমাও আছে যেমন সব কিছুরই প্রয়োজনের সীমা আছে। কাঠের চেয়ার হয়, টেবিল হয়, হরেক রকমের আসবাবপত্র হয় কিন্তু তাই ব'লে কাঠের ছুরি হয় না, টুপি হয় না, ক্ষুর হয় না। কুটির-শিল্পেরও প্রায়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনও তো অসীম নয়। কুটিরে কাপড় হয়, কাগজ হয়, জুতা হয় কিন্তু জাহাজ হয় না। নৌশিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রের শরণাপন্ন হ'তেই হবে।

যে কারণে আন্তর্জাতিকতার গোঁড়ামি এবং যন্ত্রশিল্পের গোঁড়ামি বাঞ্ছনীয় নয়—সেই কারণেই বিজ্ঞানের গোঁড়ামিও বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞানের প্রয়োজন যে অত্যন্ত বিপুল এতে কোনো সন্দেহ নেই। দারিদ্র্য ঘোচাতে হ'লে সম্পদের প্রাচুর্য্য চাই আর সম্পদের প্রাচুর্য্যের জন্য বিজ্ঞানের শরণ নিতে হবে। কিন্তু যখন আমরা বলি—যাকে আমরা মাপতে পারি, গুণতে পারি, ওজন করতে পারি তাই শুধু সত্য—আর কোন-কিছুর মূল্য নেই তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ঘটে। আর্ট, ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্য, প্রেম—এরা জীবনকে ধন্য করে কিন্তু এদের মূল্য তো দাঁড়িপাল্লায় নিরূপণ করা যায় না। কোনো দ্রব্যের কঠিনত্বকে আমরা উপলব্ধি করি স্পর্শের দ্বারা। ছোঁয়ামাত্রই জিনিষটা যে শক্ত—তা আমরা বুঝতে পারি। সৌন্দর্য্যের যে উপলব্ধি—কঠিনত্বের উপলব্ধির মতোই তা সত্য। দুটোই মন দিয়ে অনুভব করবার ব্যাপার, যুক্তিতর্ক দিয়ে মগজের সাহায্যে প্রমাণ করবার ব্যাপার নয়। পদার্থের কঠিনত্বকে সত্য বলবো কিন্তু সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেবো—এ হ'চ্ছে নিছক গোঁড়ামি। নাস্তিক্যবাদকে আমরা এই কারণেই গোঁড়ামি ব'লে মনে ক'রে থাকি। যুক্তিতর্ক দিয়ে লোকের আস্তিক্য-বুদ্ধিকে জোর ক'রে জাগ্রত করবার চেষ্টাও

আর এক রকমের গোঁড়ামি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা কোনো তর্ক করিনে। ওটা তর্কের ব্যাপারই নয়।

লীডারশীপে আমরা বিশ্বাস করি। নেতার মতো নেতা ছাড়া কোনো আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে না। প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব জাতি-গঠনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। এইজন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বকে আমরা আঘাত করিনে। সেই নেতৃত্বের উপরে আমরা জনসাধারণের বিশ্বাসকে দিনে দিনে দৃঢ়তর ক'রে তুলতে চাই। নেতার কাজ পরিচালিত করা, জনসাধারণের কাজ পরিচালিত হওয়া। নেতা যেখানে দৃঢ়তার অভাবে কর্ণধারের কাজ করতে ভুলে যায় এবং জনসাধারণ যেখানে গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে নেতার অনুসরণ করতে অস্বীকার করে সেখানে সংগ্রামে সাফল্য অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু গৌরবময় তা মুষ্টিমেয় মানুষেরই দান। ইতিহাসে যারা অখ্যাতনামা তাদের মূল্যকে আমরা ছোট করতে চাইনে। দেশে দেশে এই অখ্যাতনামা জনসাধারণের শৌর্য্যকে আশ্রয় ক'রে বিপ্লব হয়েছে বারে বারে জয়যুক্ত। গান্ধীজীর যে গঠনমূলক কার্য্যের তালিকা তার একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেবার পথে শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের চিত্তকে বিপ্লবীমুখী করে তোলা। যেখানে জনগণের চিত্তকে আমরা বিপ্লবী ক'রে তুলতে পারিনি, আনতে পারিনি তাদের মনে নির্ভীকতা এবং আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস সেখানে আমাদের গঠনমূলক কর্ম্মের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বব্যাপী গণজাগরণের ফলে ধনকুবেরদের আধিপত্যের কাল অবসানপ্রায়। সম্মুখে নূতন-যুগ-সূর্য্যের উদয়কাল আসন্ন। সেই নূতন যুগে পৃথিবীকে শাসন করবে—আজ যারা শৃঙ্খলিত সর্ব্বহারা। এই বিশ্বাসই গান্ধীজীর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন,

> But I have visions that the end of this war will mean also the end of the rule of Capital. I see coming the day of the rule of the poor, whether through force of arms or of non-violence.

> আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাই—এই লড়ায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধনকুবেরদের আধিপত্যের অবসান ঘটবে। আমি দেখতে পাচ্ছি—সর্ব্বহারাদের আধিপত্যের দিন আগতপ্রায়। সেই আধিপত্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আসতে পারে—অহিংসার পথেও আসতে পারে।

আর-একটা কথা এবং শেষ কথা। কারও কারও ধারণা—গান্ধীজী জীবনযাত্রার সরলতার উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে আমাদের বর্ব্বরতার স্তরে নামিয়ে আনতে চান। এই ধারণা ভুল। গান্ধীজীর স্বরাজের পরিকল্পনায় উপকরণের বাহুল্যে জীবন ভারাক্রান্ত নয় বটে কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য্যে প্রতিটী গৃহ সেখানে দীপ্তিমান। সেখানে

জীবন দীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত। তিনি লিখেছেন:

> According to my definition of Swaraj even the poorest Indian should eat enough milk, ghee, vegetable and fruits. Every man and woman must get a balanced diet and a decent house.
>
> আমার পরিকল্পিত স্বরাজে দীনতম ভারতবাসীও খেতে পারে প্রচুর দুধ আর ঘি, শাকসব্জী ও ফলফুলুরি। প্রত্যেক নর ও নারী ভালো বাড়ীতে বাস করবে—শরীর ধারণের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য্যও পাবে।

নবজীবন সংঘ,
৫এ, অন্নদা নিয়োগী লেন,
কলকাতা
১৩৪৮

পরিশিষ্ট - ৮

দার্শনিক কাণ্ট

রেজাউল করীম

মানুষের জীবনে "যুক্তি"র স্থান ও প্রয়োজন কতটুকু তা নিয়ে ইউরোপের দার্শনিক মহলে বহু আলোচনা হয়েছে। কোন কোন আদর্শবাদী দার্শনিক ঘোষণা করলেন যে কথায় কথায় যুক্তির আশ্রয় লওয়া খুব ভাল নয়। কেন না যুক্তি অবশেষে মানুষকে জড়বাদের দিকে নিয়ে যায়। বিশপ বার্কলে বললেন, জগতে জড়বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই। আবার অন্যদিকে দার্শনিক হিউম বললেন যে, শুধু জড়বস্তুই নয় মানুষের 'মনের'ও কোন অস্তিত্ব নাই। আবার অপর একজন দার্শনিক বললেন যে, জড়বস্তু ও মন—এ নিয়ে তর্ক করো না। এ দুটোর অন্তরালে অন্য যে সব বিষয় আছে, তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তাই এই শেষোক্ত দার্শনিকগণ ঘোষণা করলেন যে জীবনে যুক্তির কোন স্থান থাকুক আর নাই থাকুক, যুক্তির দ্বারা কোন প্রশ্নের ও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। ফরাসীদেশের বিখ্যাত মণীষী রুশো বললেন যে জীবনের বিবিধ প্রকার সঙ্কটের কালে আমরা যুক্তি অপেক্ষা feeling বা অনুভূতিকেই বেশি বিশ্বাস করি। নানা সমস্যায় বিব্রত মানুষকে অনেক সময় instinct বা সহজাত প্রেরণার উপর নির্ভর করতে হয়। এবং এইরূপ নির্ভর করাটাই অধিকতর নিরাপদ। দার্শনিক কাণ্ট যখন রুশোর "এমিলি" গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করলেন, তখন এমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর প্রত্যাহিক ভ্রমণ কার্য বন্ধ করে গ্রন্থটি শেষ করলেন। এই বইটি পাঠ করা তাঁর জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। তিনি রুশোর মধ্যে এমন একজন লেখকের সাক্ষাৎলাভ করলেন, যিনি নিরীশ্বরতার অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধারের জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কাণ্ট দেখলেন যে রুশো অত্যন্ত সাহসের সহিত যুক্তির উপরে অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে চান। কাণ্ট উপলব্ধি করলেন যে ধর্ম-বিরোধিতার ইহা একটা অকাট্য উত্তর। এর দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান হতে পারবে। এই সব তর্ক বিতর্ককে একসূত্রে গ্রথিত করা, বার্কলে ও হিউমের দর্শনকে রুশোর অনুভূতিতদ্বারা যুক্ত করা, ধর্মকে জড়বাদী যুক্তির কবল হতে উদ্ধার করা এবং সেই সঙ্গে সন্দেহবাদের (scepticism) বেড়াজাল থেকে বিজ্ঞানকে রক্ষা করা—এই মিশন পালন করার কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক এমানুয়েল কাণ্ট।

প্রুশিয়ার অন্তর্গত কনিগ্‌স্‌বার্গ শহরে ১৯২৪ খৃঃ অব্দে দার্শনিক এমানুয়েল কাণ্ট জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক তাঁর সমগ্র জীবনে নিজের শহরের বাইরে বেশিদিন ছিলেন না। আজন্ম শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক কাণ্ট দূরবর্তী দেশের ভূগোল, জাতিতত্ত্ব, সৌরজগত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রভূত আলোচনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মাত্র কয়েকদিন ব্যতীত তিনি কখনও নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাননি।

কাণ্ট ছিলেন একটি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা জার্মাণীতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কাণ্টের মা ছিলেন একজন পুরোহিতের কন্যা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা মহিলা। এই পরিবারের লোকেরা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। বংশের প্রথা অনুসারে কাণ্টও শৈশবকাল থেকে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ধর্মের খুঁটিনাটি আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডগুলি তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন। দেখা গেছে যে অত্যধিক ধর্মপরায়ণতার পরিণতি অনেক সময় উল্টা হয়ে থাকে। তাই দেখি, পরে কাণ্টের মনে এমন এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে, তিনি প্রচলিত চার্চ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলেন। অবশ্য তাই বলে তিনি কোনদিন নাস্তিক হয়ে পড়েননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জার্মাণ পিউরিটান মতবাদের আনন্দহীন প্রভাব তাঁর উপর একটা স্থায়ী ছাপ রেখে দিয়েছিল। বয়স যতই বাড়তে লাগল, ততই তিনি দার্শনিকতার দিকে অধিকতর প্রবণতা দেখাতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল যে জগতবাসীকে দিবার মত বিরাট একটা কিছু করবার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত আছে। এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

কাণ্ট যে যুগের মানুষ, সে যুগের উপর দু-দিক থেকে দু'প্রকারের প্রভাব এসে পড়েছিল—তার একটি হ'ল জার্মাণ সম্রাট ফ্রেডরিকের, অপরটি হ'ল ফরাসীদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ভলটেয়ারের। মানুষের চিন্তার উপর সন্দেহবাদের কৃষ্ণ ছায়া বিস্তার করেছিল। কাণ্ট প্রথম জীবনে এই যুগের সন্দেহবাদের প্রভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারলেন না। পরবর্তী যুগের সন্দেহবাদকে তিনি তাঁর প্রখর যুক্তির বলে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু জীবনের প্রথম যুগে তিনি এই মতবাদের প্রভাবে পতিত হয়েছিলেন। এমন কি হিউমের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হন। তাঁর চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যাবে যে, তিনি কালক্রমে প্রথম যুগের রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে জীবনের শেষের দিকে প্রায় সত্তর বছর বয়সে একটা বলিষ্ঠ উদারনৈতিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। একজন দার্শনিকের পক্ষে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ সাধারণতঃ মানুষ প্রথম

জীবনে উদার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে নানা অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতার জ্বালা ভোগ করে শেষ বয়সে রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কাণ্টের বেলায় দেখি তার বিপরীত কাণ্ড। জীবনের শেষের দিকে যখন তিনি উদার মতবাদ প্রচার করেন, তখন তাঁর দেশ ও যুগ সেজন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং এইপ্রকার মতবাদের জন্য তাঁর বিপদে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই একজন উচ্চদরের দার্শনিক হিসাবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া তিনি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। গ্যালিলিওর যুগ এটা নয়। সেইজন্য তাঁকে আরও অনেকের মত শহীদ হতে হয়নি। একই কাণ্টের মধ্যে আমরা দু-রকম কাণ্টকে দেখি—একজন রক্ষণশীল কাণ্ট। অপরজন উদার কাণ্ট। ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কথা যিনি প্রচার করলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি সেই লোকই আবার জীবনের শেষের দিকে ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। এই সময়কার কাণ্টের মধ্যে যাঁকে দেখতে পাই, অনেক সময় তাঁকে ভল্টেয়ার বলে ভুল হ'তে পারে। শোপেনহাওয়ার একদা বলেন যে, সম্রাট ফ্রেডারিকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে তাঁর কঠোর শাসনকালেই কাণ্ট স্বাধীনভাবে বিকশিত হ'তে পেরেছিলেন। এবং "ক্রিটিক অব পিওর রিজনের" মত যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করতে সাহসী হয়েছিলেন। স্মরণ করা দরকার যে কান্ট সেই সময় সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সম্রাট ফ্রেডারিক সত্যই কাণ্টকে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সম্রাট তা পারেননি। কারণ তাঁর সময় কাণ্টকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তিনি "ক্রিটিক অব পিওর রিজনের" মত গ্রন্থ আর রচনা করবেন না।

তাঁর বেতন বা ভাতা ছিল সামান্য। কিন্তু তবুও এই নিম্নস্তরের পদে প্রায় পনের বছর ধরে একাধিক্রমে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তাঁকে অধ্যাপকের পদ দিবার জন্য তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষিগণ দুবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুবারই এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে তাঁকে তর্কবিদ্যার ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। তিনি যে আদর্শ শিক্ষক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষাদান করতে করতে তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই সব অভিজ্ঞতার বলে তিনি শিক্ষাদান সম্বন্ধে একটি তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে শিক্ষাদান সম্পর্কে বহু উপদেশ আছে। এইযুগের ছাত্রসমাজ কাণ্টকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। তাঁর ছিল একটি বাস্তব নীতিবোধ। তিনি বলতেন যে, সাধারণ মাঝারি ছাত্রদেরকে বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষাদান করতে হবে। যারা নিরেট বোকা তাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কষ্ট করলেও কোন ফল লাভ হবে না। আর যারা অসাধারণ প্রতিভাশালী, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করবে ও নিজেদের পথ বেছে নেবে। তাদের জন্য ভাববার দরকার নাই।

কাণ্ট যে কোনকালে একটি নূতনতর মেটাফিজিকাল বা দার্শনিক পদ্ধতি প্রবর্তন ক'রে সমস্ত পণ্ডিতসমাজকে স্তম্ভিত করবেন, প্রথম-দিকে তা কেউ আশা করেননি। চাঞ্চল্যকর কিছু প্রকাশ করে কাউকে চমকিত করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কারণ তিনি কতকটা লাজুক ও বিনয়ী প্রকৃতির লোক ছিলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি একস্থানে লিখলেন, "এ আমার সৌভাগ্য যে আমি মেটাফিজিক্স্‌কে ভালবাসতে শিখেছি। কিন্তু আমার এই ভালবাসার ধন আমার প্রতি কোন আগ্রহ দেখায়নি। মেটাফিজিক্স্ তলহীন গহ্বর। এ যেন একটা অন্ধকার সমুদ্র, যার কোন তট নাই—নাই কোন লাইট-হাউস। এর চারিদিকে দর্শনের ধ্বংসাবশেষ ইতিস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।" যাঁরা চিন্তার উচ্চ্যশিখরে বাস করেন কাণ্ট তাঁদের আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তিনি তখনও বিদ্যুৎসমাজকে একথা বুঝাতে পারেননি যে, ইউরোপীয় জগতের অন্যতম প্রবল ঝটিকা সৃষ্টি তাঁর দ্বারাই সম্ভব হবে।

ল্যাপলাস (Laplace) একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তিনি গগনমণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা সম্বন্ধে বহু তথ্যকে অনুমানরূপে গ্রহণ করে গবেষণা করেন। এ সম্পর্কে কাণ্টের অনুমান ছিল কতকটা ল্যাপলাসের মতই। তিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর গতি ও ক্রমবিকাশের একটা মেকানিকাল বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করেন। কাণ্ট মনে করতেন যে বিভিন্ন গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে অথবা পরে হতে পারবে। তাঁর মতে যেসব গ্রহ সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত, সেগুলিকে বিকশিত ও রূপ গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছে। হয়ত সেইসব গ্রহে উচ্চস্তরের যান্ত্রিক গঠনকার্য আছে। শুধু গ্রহবিজ্ঞান নয়, নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মানুষের আগমনের পূর্বে মানুষ অন্য কোন জীবের আকারে পৃথিবীতে বসবাস করত। তাঁর মতে অতি আদিমকালে যখন মানুষকে বন্যপশুর দয়ার উপর নির্ভর করতে হত, তখন যদি মানবশিশু জন্মগ্রহণ করতে পারত এবং সুযোগ সুবিধা পেলে হয়ত ভক্ষণও করে ফেলতো। সেইজন্য কাণ্ট মনে করনে যে, আজকের যুগে সভ্যতার উচ্চস্তরে উপনীত হবার পর মানুষ যা হয়েছে, আদিযুগে সে ঠিক তেমনটি ছিল না—তার থেকে বহু দিক দিয়ে পৃথক ছিল। এই কথা বলার পর কাণ্ট চতুরতার সহিত প্রশ্ন করলেন কেমন করে প্রকৃতি মানুষের মধ্যে আধুনিক বিকাশ এনেছে এবং কি কারণে ও কিভাবে এসব ঘটেছে? তিনি বলেন যে, এসবের উত্তর আমরা জানি না। কাণ্টের এইসব প্রশ্ন ও চিন্তা এই কথারই ইঙ্গিত করে যে তিনি ডারউইনের থিওরীর পূর্বগামী।

আকারে কাণ্ট ছিলেন ছোটোখাটো মানুষ। সঙ্কুচিত স্বভাব, অল্পভাষী। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কে ছিল আধুনিক দর্শনের ইতিহাস ও মূলকথা। তাঁর কথার মধ্যে ছিল সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের স্পন্দন। তাঁর জীবন কেটেছে অত্যন্ত নিয়মমাফিকভাবে। প্রত্যহ

প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠতেন, তারপর এককাপ কফি খেতেন। তারপর আরম্ভ করতেন লেখাপড়ার কাজ। অধ্যাপনার জন্য কলেজে যেতেন যথারীতি। প্রায়ই কলেজ কামাই করতেন না। যথাসময়ে মধ্যাহ্নভোজন করতেন। বৈকালে ভ্রমণে বাহির হতেন। তাঁর প্রত্যেক কাজের নির্দিষ্ট সময় ছিল। অধ্যাপক ইমানুয়েল কাণ্ট ধূসর বর্ণের কোট পরিধান করে হাতে একটা লাঠি নিয়ে ভ্রমণের জন্য ঘরের দুয়ারে আসতেন এবং লণ্ডন তরুরাজির ক্ষুদ্র বীথিকার মধ্যে দিয়ে পদব্রজে কিছুক্ষণ বেড়াতেন। সেই সময় তাঁর প্রতিবেশিগণ স্পষ্ট বুঝতেন যে বেলা এখন সাড়ে তিনটা। এই পথে এইখানে তিনি বছরের সমস্ত বর্ষা ঋতুতে ভ্রমণ করতেন এবং যখন আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠতো অথবা ধূসর মেঘ বৃষ্টিপাতের ভয় দেখাত তখন তাঁর ভৃত্য ল্যাম্পেকে দেখা যেত তার প্রভুর খোঁজে চারিদিকে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার হাতে একটি বড় ছাতা। উদ্দেশ্য প্রভুকে বৃষ্টিজল থেকে রক্ষা করা। কাণ্টের শরীরের গঠন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সেই জন্য পথ্যাপথ্য বিচার করার ব্যাপারে তাঁকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত। তবে তিনি সহজে কোন চিকিৎসা ও ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। সব সময় নিয়ম মেনে চলতেন বলে কাণ্ট দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। প্রায় আশি বছর বেঁচে ছিলেন। সতের বৎসর বয়সের সময় তিনি লেখেন যে সঙ্কল্প দৃঢ় থাকলে মন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। তারফলে অসুস্থ হওয়ার অনুভূতিকে মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাঁর একটা প্রিয় নীতি ছিল যে তিনি সর্বদাই নাসিকার সাহায্যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন, বিশেষ করে যখন ঘরের বাইরে যেতেন। সেইজন্য শীতকালে ও বসন্তকালে দৈনিক ভ্রমণ করবার সময় তিনি কারুর সহিত কথা বলতেন না। এতে নিঃশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। তিনি বলতেন যে ঠাণ্ডালাগা অপেক্ষা নীরব থাকা ভাল। তিনি পায়ে মোজা পরবার সময়ও তাঁর এই নীতি প্রয়োগ করতেন।

যে কোন কাজ করবার পূর্বে তিনি প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করতেন। তাই বুঝি তাঁর জীবনে বিবাহের সুযোগ উপস্থিত হয়নি। কথিত আছে যে, তিনি দুটি মেয়েকে বিবাহ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এদের কোনটিকেই বিবাহ করা ঘটে উঠেনি। একটির ব্যাপারে এত দীর্ঘ সময় চিন্তা করেছিলেন যে, সেই মেয়েটি অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে অন্য একটি অধিকতর সাহসী যুবককে বিবাহ করে। অপর একটি মেয়ের বেলায়ও দেখা যায় যে, কাণ্টের মন স্থির করার পূর্বে মেয়েটি কোনিগবার্গস্ থেকে অন্যত্র চলে গেল। পরে কাণ্ট অনুভব করেছিলেন যে, বিবাহ তাঁর সত্যানুসন্ধানের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। ফলে জীবনে তাঁর আর বিবাহ করা হয়নি।

কাণ্ট বাইশ বছর বয়সে তরুণের সমস্ত উত্তেজনা নিয়ে লেখেন—"যে পথ ধরে চলতে হবে তা আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমি আমার নির্দিষ্ট পথ ধরে চলবো এবং কোন বাধাই আমাকে এই পথ থেকে ফিরাতে পারবে না।" বস্তুতঃ তিনি যে পথ অবলম্বন করলেন, অতীব ধৈর্যসহকারে সেই পথ ধরে চলতে লাগলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে, লোকের অবজ্ঞা ও অনাদরের মধ্যে তিনি তাঁর মূল্যবান রচনার খসড়া প্রস্তুত করলেন, তাকে ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করলেন, তাকে পুনরায় সংশোধন করলেন। পনের বছর ধরে এইভাবে অতীব ধৈর্যসহকারে বাস করে তাঁর জীবনের বিরাট ও যুগান্তকারী গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত করলেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ হল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স সাতান্ন বৎসর। এই গ্রন্থের নাম "দি ক্রিটিক অব পিওর রিজন।" কম মানুষই এত মন্থর গতিতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে খুব কম গ্রন্থই দর্শনের জগৎকে এমনভাবে চমকিত করতে পেরেছে। দর্শন-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কাণ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ দান "The Critique of Pure Reason"। কাণ্ট এই বিখ্যাত গ্রন্থ দ্বারা চির-জীবিত হয়ে থাকবেন। এখানে "ক্রিটিক" মানে কেবল সমালোচনা নয়, সমালোচনাপূর্ণ বিশ্লেষণ অর্থে কাণ্ট ক্রিটিক কথাটা ব্যবহার করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে বিশুদ্ধ যুক্তিকে আক্রমণ করলেন না, কেবল বিশুদ্ধ যুক্তির সীমা কতটা তাই দেখাতে চেয়েছেন। আর দেখিয়েছেন বিশুদ্ধ যুক্তির সম্ভাবনা কতটা। কাণ্ট অবিশুদ্ধ জ্ঞানের উর্দ্ধে যুক্তিকে কতকটা গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যে অবিশুদ্ধ জ্ঞান বিকৃত ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রপথে মানুষের নিকট আসে কান্ট তাকেই আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের পথে আসে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায় না। তাঁর মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। বিশুদ্ধ জ্ঞান আমরা লাভ করি আমাদের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রকৃতি থেকে, উত্তরাধিকার সূত্র থেকে, মনের উদ্দীপনা থেকে। সে জ্ঞানের জন্য কেবল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করলে তা পাওয়া যায় না। দার্শনিক হিউমের ধারণা যে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই। আমাদের মনে হচ্ছে Ideas in procession and association. অর্থাৎ একটার পর একটা করে কতকগুলি ভাবের সংযোগই হল মন, যাকে আমরা নিশ্চয়তা বলি তা সম্ভাব্য বিষয় মাত্র। আর ঐ সম্ভাব্য বিষয় যে কোন সময় অসম্ভব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হতে পারে। কাণ্ট তাঁর "ক্রিটিক অব পিওর রিজনে" হিউমের এই উক্তির উত্তর দান করলেন। তিনি বললেন যে, কোন বিষয়ে আমরা যে ভুল সিদ্ধান্ত উপনীত হই তা এই জন্য যে, আমরা ভুল বিষয়কে সত্য মনে করে অগ্রসর হই। কতকগুলি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই এবং তারপর তার থেকে অন্যান্য চিন্তা করি। সুতরাং এসব চিন্তার পরিণতি তো অনিশ্চয় হবেই। তুমি ধরে লও যে, সমস্ত জ্ঞান এক একটা

স্বতন্ত্র ও সুনিশ্চিত ইন্দ্রিয় থেকে আসে। কিন্তু যে জ্ঞান সম্বন্ধে তুমি চিরকালের জন্য নিশ্চিত হতে পার, ইন্দ্রিয় সে জ্ঞান দিতে পারে না। তুমি এমন আশা করতে পার না যে, তুমি এই চর্মচক্ষে তোমার আত্মাকে দেখতে পাবে। তোমার আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলিও তা পারে না। ইন্দ্রিয়বোধ থেকে যে জ্ঞান আসে তার থেকে সত্যকার জ্ঞানের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয় এমন জ্ঞান যদি থাকে বা পাওয়া যায় অথবা ইন্দ্রিয়ে দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই যদি কোন সত্য পাওয়া যায় তা হলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াবে? কাণ্ট বলেন এই জ্ঞান বা সত্যের নাম apriori অথবা স্বতঃসিদ্ধি বিচার, কার্য-কারণ সম্পর্কের ইহা একটা মূলগত ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের পূবেই এই জ্ঞানলাভ হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে absolute truth absolute science কি কোন দিন সম্ভব হবে? এইটাই হল কাণ্টের ক্রিটিকের প্রথম সমস্যা। কাণ্ট বলেন, আমার প্রশ্ন এই—যখন অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাদান সাহায্যকে কেড়ে লওয়া যায় তখন যুক্তির দ্বারা আমরা কি লাভের আশা করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কাণ্ট নানা কথার অবতারণা করেছেন। এইসব নানা কথার স্তূপের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ চিন্তার সমস্ত দিকের উপর আলোকপাত করেছে। জীবতত্ত্ববিদ যেমন একটি প্রাণীর দেহ নিয়ে বহুবিধ আলোচনা করেন, কাণ্টও চিন্তারূপ জীবের বহুমুখী দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ ক্রিটিক হয়ে পড়েছে "চিন্তার বাওলজি" বা জীবতত্ত্ব। ধারণার (concept) উৎস কোথায়, কিভাবে ধারণার বিকাশ হয়েছে, উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের চিন্তা কিভাবে এক লোক থেকে অন্য লোকে সঞ্চারিত হয় এসব বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কাণ্টের মতে এইসব সমস্যাই হল দর্শনের সমস্যা। তিনি বলেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কোন ক্রমেই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ হতে পারে না। ইন্দ্রিয় আমাদের বোধশক্তিকে সীমিত করে দেয়। বস্তুটা কি, যদি কেউ এ প্রশ্ন করে, তবে অভিজ্ঞতা তার একটি উত্তর দিতে পারবে। কিন্তু বস্তু যে নিশ্চয়ই এই বস্তুই হবে, অন্য বস্তু নয়—একথা অভিজ্ঞতা বলে না। সুতরাং অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বিশুদ্ধ ও সাধারণ সত্যের সংবাদ দিতে পারে না। সত্য বটে আমাদের যুক্তি এই বিশুদ্ধ ও সাধারণ জ্ঞানলাভ করতে উৎসুক। অভিজ্ঞতা এই যুক্তিকে উদ্দীপিত করতে পারে। কিন্তু তা আমাদের মনে কোন প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই কাণ্ট বলেন যে সাধারণ সত্য (General truth) অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হবে না। সাধারণ সত্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। আমাদের পরবর্তী অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, সাধারণ সত্য চিরকালই সত্য। অভিজ্ঞতালাভের পূর্বেও তা সত্য ছিল, পরেও তা সত্যই থাকবে। সমস্ত প্রকার অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ

হয়ে আমাদের চিন্তা কেমন করে অগ্রসর হয় তা কাণ্ট দেখিয়েছেন গণিতের দৃষ্টান্ত থেকে। গণিতের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী ও সুনিশ্চিত। ভবিষ্যতে আমরা এমন কোন অভিজ্ঞতা লাভ করব না যা গণিতের নিয়মকে লঙঘন করতে পারে। আগামী কাল সূর্য পশ্চিমদিকে উঠবে একথা বরং বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না যে দুই আর দুয়ে চার ছাড়া অন্য কিছু হবে। অভিজ্ঞতালাভের পূর্বে গণিতের এই হিসাব সত্য ছিল—এই সত্য কি অতীতের, কি বর্তমানের, কি ভবিষ্যতের কোন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এ সত্য নির্বস্তুক এবং অবশ্যম্ভাবী। ইহা কল্পনা করা যায় না যে এ সত্য কোনদিন অসত্যে পরিণত হবে। তাই কাণ্ট প্রশ্ন করেছেন এই নির্বস্তুক অবশ্যম্ভাবীয় জ্ঞান আমরা কোথায় থেকে লাভ করি? নিশ্চয় অভিজ্ঞতা থেকে নয়। কারণ অভিজ্ঞতা কতকগুলি সেন্‌সেশন ও ঘটনাবলী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই সেন্‌সেশন ও ঘটনা পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষের মন নিষ্ক্রিয় মোমের মত নয় যার উপর অভিজ্ঞতা তার ছাপ মেরে দিতে পারে। মন এমন একটা যন্ত্র যা অভিজ্ঞতার বিশৃঙ্খল ঘটনাবলীকে চিন্তার সুনিয়ন্ত্রিত ঐক্যবন্ধ সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানলাভের একমাত্র পন্থা বলে বিশ্বাস করেন কাণ্ট তাঁদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

উনবিংশ শতাব্দীর কতিপয় দার্শনিক কাণ্টের দার্শনিক তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর ইথিক্‌স্ বা নীতির আদর্শটাই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। কাণ্টের ইথিক্‌স্ বা নীতির মূল কথাকে বলা হয (categorical imperative) বা চূড়ান্ত অনুজ্ঞাবোধক আদর্শ। তিনি বলেন যে নীতি হচ্ছে সহজাত যুক্তি নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক জ্ঞান। সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমাকে নীতির আদর্শ পালন করতে হবে, ফললাভের দিকে দৃষ্টিপাত করা চলবে না। এমনভাবে চলতে হবে যেন তোমার কাজ সর্বজনীন কাজ হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রমবিবর্তনবাদ দর্শন বলে যে কর্তব্য জ্ঞান তা হচ্ছে ব্যক্তির মনে একটি সামাজিক ন্যাস বা গচ্ছিত বস্তুবিশেষ। এঁদের মতানুসারে বিবেকের আধেয় বস্তু অর্জন করতে হয়। সহজাত নীতিবোধ বলে কিছু নাই। নৈতিক জ্ঞান রহস্যজনকভাবে ঈশ্বরের নিকট থেকে আগত কোন বিশেষ বস্তু নয়। ইহা ক্রমবিবর্তনের ধারার পরিণতি মাত্র। বিভিন্ন যুগের মানুষের আত্মরক্ষার জন্য ইহা কতকগুলি আচরণবিধিবিশেষ। এই আচরণবিধি এলোমেলোভাবে বিকশিত হয়েছে।

কাণ্ট নিজে যে নীতির কথা প্রচার করেন সমগ্রজীবনে সেই নীতি অনুসারে চলেন। তাঁর যৌবন অত্যন্ত পবিত্রভাবে কেটেছে। তিনি চিরজীবন কঠোর কর্তব্য পালন করে গেছেন। এই কর্তব্যপালন তাঁকে দিয়েছে একটা নৈতিক মানসিকতা।

দীর্ঘ জীবন ধরে কান্টের আদর্শবাদী দর্শনের সহিত জড়বাদী-থিওরীর লড়াই চলেছিল। মনে হয় যে সর্বশেষে কাণ্ট-এরই জয় হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে উইল ডুরাণ্ট যা বলেছেন তা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব:—

"Philosophy will never agajn be so never as in the earlier and simplier days, she must always be different hereafter, and profounder, because Kant lived."

এর মর্মার্থ আদিযুগে দর্শন যেমন অকপট ও সরল ছিল তা আর হবে না। এখনকার দর্শন পৃথকতর ও গভীরতর হবে কারণ কাণ্ট এসে দর্শনকে রূপায়িত করেছেন। সত্যই কাণ্টকে আধুনিক দর্শনের গুরু বলা যেতে পারে।

বহরমপুর গার্লস কলেজ পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ: ৮-১৭

পরিশিষ্ট - ৯

পাশ্চাত্য-দর্শনের রূপরেখা

রেজাউল করীম

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা নানা ভাবে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার নিকট ঋণী। বিশেষ করে গ্রীক দর্শন দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম দেশের চিন্তাধারার উপর অপার প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম যুগের গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা।

দর্শনের কথা আলোচনা করবার সময় কতকগুলি প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। দর্শন বলতে কি বুঝায়? এর বিশেষ ক্ষেত্র কি কি? এর সার্থকতাই বা কি? কিসের জন্য দর্শনের এত প্রয়োজন? বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্নগুলি উদিত হয় সেগুলির মোটামুটি একটা উত্তর দেওয়া সম্ভব। কিন্তু দর্শনের সব প্রশ্নর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে দর্শনের সংজ্ঞা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে। একযুগে জ্ঞানের প্রায় সব বিভাগকেই দর্শনের অন্তর্ভূক্ত বিষয় বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক যুগে দর্শনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে, তদনুসারে দর্শনেরও বিচার্য্য বিষয়েরও পরিবর্তন হয়েছে। প্লেটোর যুগে বস্তু-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও দর্শনের অঙ্গ স্বরূপ গণ্য করা হত। কিন্তু এখন এসব বিষয় পৃথক পৃথক বিভাগের অন্তর্গত।

দর্শনের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সব যুগেই কঠিন বলে বিবেচিত হত। দর্শনের সংজ্ঞা দেওয়ার প্রাথমিক অসুবিধা এই যে কোন্ কোন্ বিষয়কে এর অন্তর্ভূক্ত করা উচিত সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বরাবরই ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। সে জন্য দেখা যায় যে হার্বার্ট স্পেনসার যাকে খাঁটি দর্শন বলেন, হেগেলের অনুগামীগণ সে সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আবার হেগেলের ভক্তদের সংজ্ঞাকে স্পেনসারের ভক্তগণ বাতিল করে দিবেন। যদি বলি যে, যে বিদ্যার দ্বারা Knowledge of the Absolute (পরম বস্তু জ্ঞান) কে জানা যায় তারই নাম দর্শন, ভাববস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানবিদগণ বললেন যে পৃথিবীতে Absolute বা পরমজ্ঞান বলে কিছুই নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে জানার বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে,

দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদগণই যখন দর্শনের সংজ্ঞা নিয়ে তর্কবিতর্ক করে থাকেন তখন তার সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

বস্তুতঃ দর্শনের সংজ্ঞা দেওয়া সোজা ব্যাপার নয়। ভাবদর্শন কি বস্তু তা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। একথা সত্য যে, দর্শন কতকগুলি বিশেষ বিষয় আলোচনা করে, সে সব বিষয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথক। মানুষ যখনই এই বিরাট বিশ্বের বিবিধ বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, তখন কতকগুলি প্রশ্ন ও সমস্যা তার নিকট উপস্থিত হয়। বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করলেও শুধু তার দ্বারা সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, সব সমস্যার সমাধান হয় না। দর্শন ও বস্তুবিজ্ঞানের অতীত কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই হ'ল দর্শনের কাজ। জ্ঞানের অপরাপর বিভাগগুলি বিশ্বের নানা বিষয়ের খণ্ড খণ্ড দিক নিয়েই আলোচনা করে ও তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু দর্শন বিশেষ একটা বিষয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং দর্শন চায় সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বিষয়টাকেই জানতে ও উপলব্ধি করতে। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের মূল তত্ত্বটাই হল দর্শনের আলোচনার অঙ্গীভূত বিষয়। দার্শনিকের মতে সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড সত্তা। তার সম্বন্ধে Ideal knowledge বা ভাগবত জ্ঞান একই প্রকার হতে বাধ্য। অপরাপর বিষয়ের মত এই সব বিষয়েও বিশেষীকরণ ও বিভাগীকরণের নীতি প্রযুক্ত হতে পারে। আমরা যাকে বলি "সৌরমণ্ডল" জ্যোর্তিবিদ্ তাই নিয়ে আলোচনা করেন। বোটানিষ্ট আলোচনা করেন তরুলতা গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে। সাইকোলজির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মনের অবস্থা। কিন্তু দর্শন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ একটা দিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না। এ সকলের অন্তরালে যে মৌলিক সত্য, অস্তিত্ব ও সত্তা বিরাজমান আছে তাই হল দর্শনের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক বস্তুর মূল স্বরূপ কি? তার বাহ্যিক অস্তিত্ব কতটা সত্য, তার আদি অন্ত কোথায়? এইসকল বিষয় দর্শনের আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে। দর্শন সমগ্র বিশ্বকে দেখে একটা Single Co-ordinated System of things রূপে, পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত একই নিয়মের অন্তর্গত একটা সত্তা হিসাবে। এইভাবে বিশ্বের সমগ্র সত্তার যে জ্ঞান চর্চা তাকে বলা যেতে পারে— Science of things in General অর্থাৎ সাধারণভাবে সমগ্র বস্তুর জ্ঞান। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মৌলিক বস্তুই দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। গুটিকতক দৃষ্টান্ত থেকে একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা (generalise) এই-টাই হল সমস্ত বিজ্ঞানের লক্ষ্য। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়কে এমন নিয়মের অধীনে আনয়ন করা যায় ফলে একটা Law বা বিধি বা সূত্র সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বিজ্ঞান একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে আনবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সাধারণ নিয়ম বা বিধি এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যে বিশ্বের প্রায় সব বিষয়ই তার অধীনে এসে পড়ে। এরূপ করতে পারলেই যেন বিজ্ঞানবিদের

সাধনা সার্থক হয়। সংক্ষেপে বিজ্ঞান সব কিছুকেই একটা ultimate principle বা চরমতম নিয়ম বা নীতির মধ্যে আনয়ণ করতে চায়।

সব কিছুই একটা সাধারণ নিয়ম বা বিধির মধ্যে আনতে গিয়ে বিজ্ঞান কতকগুলি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে ও স্বীকার করে নেয়। কারণ তা প্রমাণ করা যায় না। অথচ সেগুলিকে গ্রহণ করলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু দর্শনের কাজ আরও গভীর ও অন্তর্ব্যাপী। দর্শন প্রত্যেক বস্তুকে তার চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে চায়। কেউ কেউ বলবেন যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা বলা গেল তা ঠিক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল কথা ত এই যে, যে কোন কিছুকেই Assumed বা স্বীকৃত বলে গ্রহণ না করা। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিজ্ঞানের দাবী সত্য। কিন্তু সেই সীমার বাইরে যেতে হলে আর কোন প্রকারে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। তাকে বহু অপ্রমাণিত বিষয়কেও স্বীকৃত বলেই গ্রহণ করতে হয়। বস্তুতঃ সমগ্র বিজ্ঞান কতকগুলি নীতিবিধি ও ঘটনাকে আপাততঃ স্বীকৃত বলে গ্রহণ করে নেয়। তার নিকট এই সব স্বীকৃত বিষয়গুলি হচ্ছে ultimate truth বা চরম সত্য। এরপরেই দর্শনের কাজ আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান যাকে বিনা প্রমাণে স্বীকৃত চরম সত্য বলে গ্রহণ করে তারই মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করাই হল দর্শনের অন্যতম কাজ।

প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলে জ্ঞানের যে সূত্রকে বিজ্ঞান ছেড়ে দেয় দার্শনিকের কাজ হল সেই সূত্রকে অবলম্বন করা, তার স্বরূপ আবিষ্কার করা, তাকে অনুভূতির মধ্যে আনা অর্থাৎ বিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ হয় দর্শনের কাজ সেখান থেকেই আরম্ভ হয়। স্বতঃসিদ্ধ বলে বিজ্ঞান যাকে ধরে নেয়, দর্শন তারই মূল স্বত্তার অনুসন্ধান করে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। জ্যামিতি অর্থে ক্ষেত্র পরিমিত বা ক্ষেত্রমাপ। Space বা স্থানের বিস্তৃতির বিষয় নিয়ে এ শাস্ত্র রচিত। কিন্তু স্পেস জিনিষটা কি তা এর আলোচ্য বিষয় নয়। ক্ষেত্র যাই হোক না কেন সাধারণ অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে যে জ্ঞান দেয় তারই উপর নির্ভর করে জ্যামিতির নিয়মগুলি রচিত। জ্যামিতি স্পেস্কে স্বীকৃত সত্য বলে গ্রহণ করে। কোন জ্যামিতির পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন না স্পেস্ জিনিষটা আদতে কি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হল দর্শনের কাজ। কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর জ্যামিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তার নিকট সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ। তার মূল নীতিকে বলে Axioms বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। দুটি সরল রেখা কখনও কোন স্থানকে আবৃত করতে পারেন না। সমবস্তুর সহিত সমবস্তু যুক্ত হলে তার ফলও সমান হবে। এইগুলি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়। এই সব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের মূল কারণ জ্যামিতি অনুসন্ধান করতে যায় না। এ সবের মূল কারণ অনুসন্ধান

করাই হল দর্শনের কাজ। দর্শন জিজ্ঞাসা করে 'বস্তু', জিনিষটা মূলতঃ কি? কি নিয়ে ও কোথা থেকে বস্তুর উদ্ভব? বস্তু-বিজ্ঞানীর নিকট এ সমস্ত চির পরিচিত বিষয়। এ সম্বন্ধে দর্শন যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার প্রকৃতি বিভিন্ন। দর্শনের প্রশ্ন Physical existence বা দৈহিক অস্তিত্ব জিনিষটা কি জিনিষ? বস্তুবিজ্ঞান এ জিনিষের উত্তর দিতে চায় না। বস্তুবিজ্ঞান এটুকুই বলে যে, এক রকম বস্তু অন্য রকম বস্তু থেকে বিভিন্ন। কিন্তু বস্তুর আসল প্রকৃতিটা কি বিজ্ঞান সে উত্তর দেয় না। দর্শন অগ্রসর হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন। কিন্তু কেন বিশ্ব বলে একটা জিনিষের অস্তিত্ব আছে তা নিয়ে বিজ্ঞান কিছু বলে না। একথা কি সত্য যে, এই বিশ্বের অন্তরালে একটি চরম সত্য বিদ্যমান আছে যার থেকে গোটা ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়েছে?

তা বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি ধরণের চরম সত্য। এই চরম সত্য কি কোন প্রাণহীন বস্তু অথবা একটা সচেতন মন, অথবা বস্তু ও মন থেকে বিভিন্ন কোন স্বত্তা? এই স্বত্তা সৎ না অসৎ? এটা যদি সৎ হয় তবে কেন পৃথিবীতে অসতের ছড়াছড়ি? এসব প্রশ্ন দর্শনের। বিজ্ঞান এখানে নীরব।

বিজ্ঞান Law of causation বা কার্য্যকারণের নিয়মকে স্বীকার করে। যার আরম্ভ আছে তার একটা কারণও আছে। একই কারণ থেকে একই পরিণতি প্রকাশ পাবে। যদি আমরা কার্য্যকারণের সম্পর্ককে অস্বীকার করি তা'হলে সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই সব সত্য স্বীকৃত। একই রূপ কারণ সর্ব্বদা একই রূপ পরিণতি সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন এই কার্য্যকারণের এই সত্যকে কেমন করে জানব। বিজ্ঞান কেবল নিয়মটার অস্তিত্বের কথাটাই বলে। যে কোন ঘটনার কারণ খুজে বের করতে চায়। তার বেশী একটুও অগ্রসর হয় না। বিজ্ঞান কার্য্যকারণের মূল নিয়মকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেয়। ইহা কেন সত্য, এর ভিত্তিটা কি, কেমন করে জানব এসব সত্য—এই সব হচ্ছে দর্শনের প্রশ্ন।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মানুষের চিন্তা ও বিচার শক্তি এত স্থুল ও সীমিত যে ঐ সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং ইহাই ভাল যে, সে যেন ঐ সব গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামায়। তার সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে অসীম বিষয়কে সে কি ভাবে বিচার করবে? এই ধরণের কথা খুবই স্বাভাবিক। তবুও এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রাপ্তির জন্য মানুষ যুগে যুগে বহু চিন্তা গবেষণা, ধ্যান ও তপস্যা করছে। এই প্রকার প্রশ্নই হচ্ছে দর্শনের মৌল সমস্যা। প্রাচীন আর্যগণ ও গ্রীকগণ এই সব মৌলিক প্রশ্ন করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল পাশ্চাত্যদেশের গ্রীকদের দর্শন চিন্তা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব।

সাধারণ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, মানুষের সীমাবদ্ধ মন অসীম সত্তা সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। যে সব কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে জনমতের মত হয়ে পড়েছে সেগুলিকে মানুষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিয়েছে। সেই সব জনশ্রুতিমূলক বিশ্বাস ও ধারণা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যারা এই সব জনশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তারা যত্ন সহকারে সেই বিশ্বাসকে যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে না। সত্য থেকে মিথ্যাকে বিভক্ত করে দেখতে শিখেনি। বরং প্রচলিত কথা ও বিশ্বাসকে সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করেও বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেয়। এবং অবশেষে তাকেই সর্ববাদী মত বলে গ্রহণ করে। তারা কষ্ট স্বীকার করে এর বেশি অগ্রসর হয় না। মন জিনিষটা কি? সীমিত বলতে কি বুঝায়? অসীম সত্যই বা কি? এসব সূক্ষ্ম ভাবে জানবার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু এসব অনুসন্ধান সহজ ব্যাপার নয়। দর্শন কিন্তু এসব বিষয় অনুসন্ধান করতে পশ্চাৎপদ হয় না।

"সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিশ্ব" ইহাই হল দর্শনের বিষয়বস্তু। মনে রাখা দরকার দর্শন কিছুই স্বীকৃত বলে মেনে নেয় না। দর্শনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা চিন্তাকে sensuous বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে non-sensuous বা ইন্দ্রিয়াতীত লোকে নিয়ে যেতে চায়। এবং যাকে বলে Pure thought বা বিশুদ্ধ চিন্তা তাতেই উপনীত হতে চায়। চিন্তাই দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টার একটু ব্যাখ্যা দরকার। আমরা সাধারণতঃ দুটি জগত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে সচেতন—একটি হল Physical world বা জড় ও বাহ্যজগত। অপরটি হল Internal mental world বা আভ্যন্তরিন মনোজগত। চারিদিকে লক্ষ্য করলেই বাহ্য ও জড়জগত সম্বন্ধে সচেতন হই। আর যদি দৃষ্টিকে একটু ভিতরের দিকে প্রসারিত করি এবং নিজের মনের দিকে তাকাই, তবে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, জড় জগতের বাইরেও আরও একটা জগত আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই দুটো জগতের মধ্যে কোনটি অধিকতর বাস্তব ও সত্য। যা মানুষের কাছে খুবই পরিচিত সেইটাই কি বেশী সত্য? যার সঙ্গে জন্মাবধি বিবিধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিচিত ও যার সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করি সেইটাই কি বেশী সত্য? দর্শন এই সব নিয়ে আলোচনা করে ও বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

আমরা অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা মানবিক জগতকে জানতে ও উপলব্ধি করতে পারি। এই অর্ন্তদৃষ্টির অভ্যাস তরুণ বয়স থেকে প্রখর হতে থাকে। অবশ্য কোন কোন লোক এর কোন সন্ধান পায় না। জীবনের প্রথম কয়েকটি impressionable age বা অঙ্কনযোগ্য বয়সে যখন ধীরে ধীরে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের স্থায়ী ধারণা গঠিত হতে থাকে তখন আমরা জড় জগতের ব্যাপারে বেশি করে সংশ্লিষ্ট হতে থাকি। মানসিক

জগত সম্বন্ধে তখন আমাদের অল্প পরিচয় ঘটে। বাহ্য জগতের তুলনায় মানসিক জগত মর্ত্ত্যে একটা ছায়া বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের মনের ঝোঁক জড়বাদী হয়ে পড়ে।

কিন্তু তবুও একটা অনুভূতি ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করতে থাকে— বাহ্য জগতের বাইরে কি আছে সেটা দেখবার বা জানবার আগ্রহ জাগ্রত হয়। দর্শন তখন আমাদেরকে সাহায্য করে। কারণ অজানাকে জানবার চেষ্টাই হল দর্শনের কাজ। কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী ও মরমী সাধক অন্তর জগতকে symbol বা রূপক ভাবে দেখেন। মিষ্টিকভাব বা মরমীভাবের অনুকম্পায় তাঁদের মন বহু ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়। দর্শনের কাজ একটু পৃথক। দর্শন এ জগতকে অতিক্রম করে আরও গভীরে প্রবেশ করতে চায়। দর্শন রূপকবর্জিত নগ্ন সত্যকে জানবার ও লাভ করবার চেষ্টা করে। রূপকের পশ্চাতে যে স্বত্তা আছে সেটাকে জানতে চায়। সেজন্য বলা হয় যে দর্শন কঠিন ও ভাবঘন। দর্শনের ব্যাপারে সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, ইহা একেবারেই Non-sensuous বা অনেন্দ্রিয় বস্তু। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয় নিয়ে এ চিন্তা করে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে জগত বিদ্যমান, যখন সেই জগতের কথা চিন্তা করি তখন নানা অসুবিধা দেখা দেয়। তখন আমরা একটা Non-sensuous বিষয়কেই ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে চাই। আমরা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্বন্ধে মনে মনে একটা চিত্র অঙ্কন করি তার একটা মূর্তি আঁকি। মনে মনে ছবি আঁকি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর দ্বারা তৈরী করি। কিন্তু Pure thought বা বিশুদ্ধ চিন্তা এই ছবি থেকে বিভিন্ন। এই ছবির অন্তরালে যে তার সত্তা আছে দর্শন সেটাকেই জানতে চায়। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কাজ। বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক পারমেনিডিস ও প্লেটোর মত সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণও এসব ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তা করতে গিয়ে, উপমা, চিত্র প্রতীক প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সত্য বটে মাঝে মাঝে তারা বিশুদ্ধ চিন্তায় উপনীত হয়েছেন। কিন্তু পরে Sensuous thinking বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য চিন্তার কবলে পতিত হয়েছেন। এবং যে সব বিষয় চিত্রিত করা সম্ভব নয় সেগুলি সম্বন্ধে মানসিক চিত্র এঁকেছেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁদেরকেও পরস্পর বিরোধী ভাব প্রকাশ করতে হয়েছে। দর্শনের গোড়ার কথা আলোচনা করবার সময় এসব অসুবিধার কথা স্মরণ করা দরকার।

বর্তমান যুগে দর্শনকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—যেমন মেটা ফিজিকস বা প্রকৃতিত্ত্বের থিওরী, ইথিকস্ বা সৎ-অসতের থিওরী—ইস্থেটিকস বা নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন যুগের গ্রীকগণ দর্শনকে এভাবে বিভক্ত করে দেখেননি। অধুনা জগতের বিভিন্ন দেশে দর্শনের বহু উন্নতি হয়েছে। বর্তমান ইউরোপের দর্শনশাস্ত্র প্রাচীন গ্রীক দর্শনের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী।

গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ট শতাব্দীতে। এই যে বিরাট বিশাল বিচিত্র জগত ইহার ব্যাখ্যা কি? এই প্রশ্ন গ্রীকদের চিন্তিত করেছিল। ইহারই বৈজ্ঞানিক উত্তর থেকে গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত। এখনকার ভূগোলে ইউরোপের যে অংশটা গ্রীস দেশ বলে চিহ্নিত প্রাচীন যুগের গ্রীস ছিল তার চেয়েও বিস্তৃত অঞ্চল। মূল গ্রীসের বাইরেও বহু অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই মূল গ্রীসের বহুলোক ইজিয়ান সাগরের কয়েকটা দ্বীপে, এশিয়া মাইনরের কতিপয় অঞ্চলে, সিসিলিতে ও অন্যান্য স্থানে বসতি বিস্তার করেছিল। এই সব গ্রীক অধ্যুষিত অঞ্চলের গ্রীকগণ কর্ত্তৃক যে দর্শন বিকাশ লাভ করে তাও গ্রীক দর্শন বলেই খ্যাত। গ্রীকগণ সাধারণতঃ দার্শনিক জাতি। তারা যেখানেই বসতি বিস্তার করেছে সেইখানেই দর্শন চর্চা করেছে। সক্রেটিসের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা যে গ্রীক দর্শনের পরিচয় পাই তা সাধাবণতঃ মূল গ্রীসের বাইরে গ্রীকগণের দ্বারাই বিকশিত হয়েছিল।

গ্রীক দর্শনের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথম যুগ হচ্ছে প্রাক-সক্রেটিস যুগের গ্রীকদর্শন। এ যুগের দর্শনের ইতিহাসে সোফিষ্টদেরকে (Sophist) ধরা হয়নি। সোফিষ্টগণ সক্রেটিসের যুগের পূর্ব্ব থেকেই জ্ঞান চর্চা করত। সক্রেটিসের যুগেও তাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

গ্রীক দর্শনের দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে সক্রেটিস থেকে আরিষ্টোটোলের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লেটো এই যুগের একজন প্রধান দার্শনিক। এই যুগ গ্রীক দর্শনের সুবর্ণযুগ। গ্রীক দর্শনের পূর্ণ বিকাশ হয় এই যুগে। এই যুগের দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিষ্টোটোলের পরবর্তী যুগ গ্রীক দর্শনের তৃতীয় যুগ। এ যুগে গ্রীকদের জাতীয় চিন্তার অবনতি হয়েছিল। তবে গ্রীক দর্শনকে এই যে তিনটি যুগের ভাগ করা হল তা বৈজ্ঞানিক বিভাগ নয়। প্রত্যেক যুগেবই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টোটোল এই তিনজন দার্শনিকের চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় বহু লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের পূর্ববর্ত্তীগণের চিন্তা ও ধ্যান ধারণার কথা টুকরো টুকরো ভাবে বিভিন্ন স্থানে থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন লিখিত প্রাচীন পুস্তকে তাঁদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

আজকাল দর্শনের ছাত্র, অধ্যাপক ও কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউ বড় একটা গ্রীক দর্শন পাঠ করে না। কিন্তু একযুগে ইউরোপে গ্রীক দর্শন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পঠিত হত। ইহাই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান ভাণ্ডার। গ্রীক দর্শনে অভিজ্ঞ না হলে সেকালে কেউ পণ্ডিত বলে গণ্য হতেন না। কোন বিষয়কে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার ও উপলব্ধি করবার প্রযাসই হচ্ছে গ্রীক দর্শনের মূল প্রেরণা। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে ইহাই ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। পরে ইউরোপ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করল। এই ধর্ম্ম আনলো ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অচলা ভক্তি ও একান্ত

আত্মসমর্পন। ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হতে লাগল। সর্বত্র গ্রীক দর্শনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। আজ পর্য্যন্ত চিন্তার দিক দিয়ে এই রেনাসাঁসের যুগই চলছে। অমর মানুষ যুগে যুগে নতুন নতুন ভাবে চিন্তা করে যাচ্ছে। আবিষ্কার করে যাচ্ছে। কিন্তু সেই অতীত গ্রীক-যুগের দর্শনের মূল্য একটুও হ্রাস পায়নি। নৈর্ব্যক্তিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তার জন্য গ্রীক দর্শনে জ্ঞান লাভ করা একান্ত দরকার।

২

কি অতীতে কি বর্তমান যুগে মানিষ সব সময়েই অজানাকে জানতে চায়। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা চারিপাশের বিবিধ প্রকার বস্তু-নিচয়ের পরিচয় লাভ করি। বস্তুর তাহাই শেষ কথা নয় বা সবটাও নয়। এই বাহ্য জগতের পশ্চাতে কিছু আছে কিনা তা জানবার আগ্রহ বা কৌতুহল আমাদের সকলের আছে। এ সবের পশ্চাতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি? এই সব বিষয় জানবার আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই অজানাকে জানার ইচ্ছা থেকেই দর্শন বা ফিলজফির উৎপত্তি।

অতীতকালে মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রকৃতি-রাজ্যের যতটা জানতে পেরেছিল তা ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। ধীরে ধীরে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এমন সব বিষয় জানতে পারলো যা আরও অতীত যুগে জানা সম্ভব ছিল না। পৃথিবী তথা মানব সভ্যতা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। প্রতি যুগেই কত নূতন নূতন বিষয আবিষ্কৃত হয়ে যাচ্ছে। এই সব আবিষ্কারের ফলে অতীতের বহু বিষয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভ্রান্ত ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে—আবার আজকের যুগে এটা বেশ বুঝা গেছে যে, আগামী একশ বছর পরে এ যুগের বহু ধারণা ও সত্য ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। অতীত যুগে চন্দ্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল এক রকম। আজ সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আজ মানুষ সেই রহস্যভরা চাঁদে অবতীর্ণ হচ্ছে—তার সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আজকের চাঁদ আর সেই অতীত যুগের চাঁদ নয়। আজকের চাঁদ একটা বাস্তব বস্তু।

দর্শন অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অতীতকালে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানুষ অজানাকে জানবাব চেষ্টা করত আজ তার মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। যে অনুসন্ধিৎসার স্পিরিট বর্তমান যুগে দর্শন বিজ্ঞানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে সেই স্পিরিটকে বুঝতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে বর্তমানকালের দর্শনের সহিত অতীত যুগের দর্শনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্যটা কি ও কোথায়? তুলনামূলকভাবে ও অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সে সব বিষয়কে বিচার করতে

হবে। দুই যুগের দর্শনের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যটা কতকগুলি মনোভাব থেকে বুঝা যায়।

একটি মনোভাব বর্তমান যুগের দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায়। সেটা প্রাচীনকালে ছিল না— সেটা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। অতীতের দার্শনিকগণ সাধারণতঃ aesthetic বা সৌন্দর্য্যের বা নান্দনিক দিক দিয়ে পৃথিবীকে ও বস্তুকে বিচার করতেন। মধ্যযুগের স্কলাষ্টিক দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে ছিল ধর্মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচীন গ্রীকগণ সৌন্দর্য্যে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের দেব দেবী এবং এইসব দেব দেবীদের সঙ্গে সংযুক্ত যে সব শিল্পকলা ও সাহিত্য ছিল—সেগুলিও তাদের এই সৌন্দর্যবোধ থেকে উদ্ভূত। যখন তাদের দর্শন তাদের ধর্ম্ম থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখনও তারা মনে করতে লাগল যে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলিত ও সুপরিচালিত ও সুন্দর। সত্য, সুন্দর ও সাধুতার ধারণা তাদের মনে অচ্ছেদ্যভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছে। যা চরম ভাল তা তাদের নিকট হয়ে উঠলো পরম সুন্দর। তাঁদের মনে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল অচ্ছেদ্যভাবে একই হয়ে গিয়েছিল যা highest good বা চরম মঙ্গল তাই তাদের নিকট ছিল চরম সুন্দর। ধার্মিক মানুষ বলতে তারা সুন্দর ও সৎ মানুষকেই বুঝত। তাদের সব চিন্তাকে শাসন করত যুক্তি। পৃথিবীর চরম বা আদি কারণ ও তার উদ্দেশ্য বলতে তারা বুঝত ঘটনার পারম্পর্য্য। তাদের বিজ্ঞানবোধ অনুসারে তারা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিল যে আকাশ মণ্ডলে গ্রহ তারকাবলী একটি বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ তারা জানত যে, তা সৃষ্টির আরম্ভকাল থেকেই বিদ্যমান আছে। তারা আরও মনে করত যে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর ক্রমবিকাশের ধারায় তাদেরও একটা অংশ আছে। তারাও এই বিকাশকে সহায়তা করে। অতীত যুগের দর্শন সংক্রান্ত ঐতিহ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক মূল্য ছিল। সে যুগের দর্শনিকগণ নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক সত্যসন্ধানী ছিলেন। তাঁরা যে কোন প্রতিপাদ্য বিষয়কে তার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন—সে সিদ্ধান্ত যেখানেই নিয়ে যাক না কেন—তাতে তারা কুণ্ঠিত হতেন না। Order এবং Beauty শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবোধের উপর পূর্ণ বিশ্বাস তাঁদের চিন্তাকে প্রভাবিত করত।

বহুদিন ধরে গ্রীক দর্শনই ইউরোপের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এই প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। খৃষ্টিয়ান চার্চ এই দর্শনকে রূপায়িত করতে চাইল। "পৃথিবীতে কি ঘটে যাচ্ছে" এটাই ছিল গ্রীকগণের দেখবার বিষয়। চার্চ শিক্ষা দিল অতটুকুতে চলবে না। "কি হওয়া উচিত" সেটাও দেখতে হবে। মধ্য যুগের চার্চ দর্শনের মধ্যে আনলো ঈশ্বরতত্ত্ব। সে তত্ত্ব কোন কোন মহাপুরুষের নিকট ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত সত্য রূপে প্রতিভাত হ'ত। চার্চের প্রভাবের ফলে যুক্তি অপেক্ষা ধর্মের ডগ্‌মা নিয়ম কানুন বিশ্বাস অধিকতর সুগঠিত আকারে প্রচারিত হ'তে লাগল। এখন থেকে দর্শন তথা দার্শনিকদের প্রধান কাজ হ'ল ধর্মের ডগমার ব্যাখ্যা করা।

তাতে কিছুটা যুক্তি প্রয়োগেও করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাদের নিকট দর্শন হয়ে পড়লো ধর্মযাজকদের হাতের ক্রীড়নক। বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাসের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে যাকে সত্য বলে মনে করা হত তাকেই বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বুঝবার বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিল। অতীত যুগের ও মধ্যযুগের দর্শনের এই সব ধারণা খুব বৈজ্ঞানিক ছিল না। যেদিন থেকে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দর্শনকে বুঝবার ও বুঝাবার প্রয়াস হ'তে লাগল বস্তুতঃ সেইদিন থেকেই আধুনিক দর্শনের সূত্রপাত হ'তে লাগল।

কোন বিষয়ের মূল্যবোধ স্বতঃসিদ্ধ ভাবে সম্ভাব্য ঘটনার সত্যকে সুনিশ্চিত বলে প্রমাণ করে না। আর দার্শনিকের চিন্তার পথে সীমা বেঁধে দেয় না। অথবা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে সে সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দেশ দেয় না। বর্তমান যুগে দর্শনশাস্ত্র আর থিওলজি বা ধর্মতত্ত্বের ক্রীড়নক নয়। আজ দর্শন দ্রুত প্রসারশীল বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ বিজ্ঞান যেমন দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি নিয়ে চিন্তা করে দর্শনও তাতে একটুও ভীত নয়। আজ দর্শন প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ফলকে সামগ্রিক ভাবে জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায় এবং এই অবস্থায় শিল্পনীতিতেও ধর্মের স্থান হ'তে পারে এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা যেতে পারে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমগ্র ঘটনাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার, এবং যতদূর সম্ভব সর্বত্র জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। সত্যের সন্ধানের জন্য অবিরত আপোষহীন ভাবে সাধনা করে যেতে হবে— এইটাই হ'ল আধুনিক দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক দর্শন সৌন্দর্য্যকে ভালবাসে। এবং ব্যক্তিগত ধর্মবোধ ও সামাজিক সুবিচারকে সম্মান দান করে।

আধুনিক দর্শনের অন্যতম প্রধান স্পিরিট হচ্ছে ব্যক্তি ভিত্তিক। এক একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ দর্শন বিকশিত হয়েছে। যেমন ডের্কাটীয় দর্শন কান্টিয় দর্শন হেগেলিয়ান দর্শন ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন যুগের দর্শন ছিল প্রতিষ্ঠানিক। প্লেটো ও আরিষ্টোটোল ছিলেন গ্রীক দর্শনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁরা নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বহু বছর পর বহু সংগ্রামের পরাজয়ের পর গ্রীসের ছোট ছোট নগর রাজ্যগুলি তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললো। এই সময়ে গ্রীসে Stoic গণের প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্টোইকগণ সুখ ও দুঃখে সমভাবে উদাসীন। গ্রীকদের স্বাধীনতা চলে গেল। সাধারণতঃ মানুষ দুঃখ ও মনোবেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লো। তাদের এই দুঃসময়ে স্টোইকগণ সুখ ও দুঃখে উদাসীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মনে কিছুটা সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করেছিল। তারা এই শিক্ষা দিল যে সমগ্র জগতই ত মানুষ ও দেবতাদের নিয়ে একটি বিরাট নগর-রাষ্ট্র। পরে

রোমকগণের মধ্যে মিসিরো ও সেনেকা গ্রীক দর্শনকে রোমান জীবনের সহিত খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা নাগরিকদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। দার্শনিক চিন্তায় রোমকগণের দান খুব বেশী ছিল না। রোমকদের দার্শনিক চিন্তা "জুরিসপ্রুডেন্স" বা ব্যবহারগত আইনের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। এই আইনের দর্শন হচ্ছে কতকটা বুদ্ধির বিষয়। এপিকিউরিয়ান বা সুখভোগবাদী দার্শনিকদেরও প্রাদুর্ভাব ছিল গ্রীসে। সে দর্শন রোমেও প্রচারিত হয়েছিল। এই সুখভোগবাদী দার্শনিক ও নবপ্লেটোনিয়াম ব্যতীত অন্যান্য দার্শকিগণ মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে বিবেচনা করতেন। মধ্যযুগের দার্শনিকগণ নগর-রাষ্ট্রের কথা যেমন ভাবতেন তেমনি ভাবতেন সাম্রাজ্যের কথা এবং সমস্ত মানব সমাজকেই চার্চের নিয়মাবলীর অধীনেই রাখা হত। মধ্যযুগের মানুষের জীবন একদিকে চার্চ ও অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সে যুগের দার্শনিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিলেন চার্চের সন্ন্যাসীগণ (monk)। এইসব সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁরা চার্চের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য না রেখে অনেক সময় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতেন। তবে অধিকাংশ ধর্ম্মযাজকগণ রক্ষণশীল মনোভাবই প্রকাশ করতেন।

প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের সহিত তুলনা করলে দেখা যাবে যে আধুনিক দর্শন দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল।

একজন আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অর্থে ব্যক্তিতান্ত্রিক যে, তিনি নিজের জন্য নিজেই গবেষণা করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। তিনি নিজের চোখ দিয়ে প্রত্যেকটি অনুমানকে ভেরিফাই বা যথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। তিনি লজিকের যুক্তিকে নিজের চিন্তা দিয়ে পরীক্ষা করবেন। তিনি পূর্বের অথারিটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না। অথবা সেগুলি একেবারেই বাতিল করেন না। তিনি কিছু কিছু ইঙ্গিত পাবার জন্য অথারিটিদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। প্রচলিত পুস্তকে যে সব ঘটনাকে অকাট্য সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তিনি সেগুলিকে "সম্ভাব্য" সত্য বলে গ্রহণ করেন। অতীতের কোন অথারিটী সত্য বলে মেনে নিয়েছে এই যুক্তিতে তিনি কোন কিছুকেই বিনা প্রমাণে স্বীকার করেন না। আধুনিক যুগের দার্শনিক হাইপথিসিস বা অনুমানকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন ও বিকাশ করেন।

প্রতি বছর বিজ্ঞানের নূতন বিকাশ ও আবিষ্কারকে তিনি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেন। তিনি যে গবেষণা কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের তুলনামূলক অলোচনা করেন। সেই জন্য বলা হয় যে, আধুনিক যুগের দার্শনিকগণ সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ব্যক্তিতান্ত্রিক। আধুনিক যুগের বড় বড় দার্শনিকগণ সমস্ত মুখ্য বিষয়ে একমত হয়েছেন একথা বলা চলে

না। প্রত্যেক দার্শনিকই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমানকে নিজেই পরীক্ষা করেন। এবং স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। মনে রাখা দরকার এই বিশ্ব কত বিরাট ও প্রকাণ্ড। বিচিত্র এর লীলাখেলা। এক একটা বিষয়ের কত শাখা প্রশাখা আছে। সেইজন্য বোধহয় যখন কোন দার্শনিক স্বাধীনভাবে প্রকৃতি অথবা মানুষ সম্বন্ধে কোন নূতন সত্য ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি বস্তুর সেইসব দিকটাকে দেখেন যা অন্য কেহ ইতিপূর্ব্বে হয়ত দেখতে পায়নি। আধুনিক দার্শনিকদের এইটাই হ'ল বিশেষত্ব। অনেক সময় মত পার্থক্যও হয়েছে। আবার বহু বিষয়ে একমতও হয়েছেন।

কোন বস্তুকে বিচার করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাকে উৎসাহ দেয়, এবং ক্রমোন্নতির দিকেও নিয়ে যায়। এ বিষয়ে আর একটা কথা বিবেচ্য। আধুনিক দর্শন বহুলাংশে আন্তর্জাতিক হয়ে পড়েছে। আর প্রাচীনকালের দর্শনের সীমা ছিল একটি দেশ বা জাতি। অর্থাৎ প্রাচীন দর্শন ছিল জাতীয় দর্শন। মধ্যযুগের দর্শন ছিল সার্বভৌম (Cosmopolition)। ইউরোপের প্রাচীন দর্শনের সবটাই ছিল গ্রীক দর্শন। গ্রীকের জাতীয় বিবেক ও গ্রীক জীবন দর্শনই এই দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছিল। গ্রীকগণই এই দর্শনের বিকাশ করে এবং পরবর্তী যুগের ইউরোপ এই গ্রীক দর্শন দ্বারা বহুভাবে উপকৃত ও প্রভাবিত হয়েছে। পূর্ব্বে বলেছি যে, মধ্যযুগের দর্শন ছিল সার্ব্বভৌম, এর যেমন ভাল দিক ছিল তেমনি ছিল মন্দ দিক। সে যুগে চার্চের সাধু সন্ন্যাসীগণ চিন্তা করতেন, শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁদের দর্শনের পুস্তকাবলী ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ছিল। সেই সময় এই ল্যাটিন ভাষা ছিল পণ্ডিতদের সার্ব্বজনীন ভাষা। ইহা একদিকে ভালই ছিল। তাঁরা তখন অবাধে একদেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমন করতে পারতেন। এবং সার্ব্বজনীন ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনায়াসে ভাব বিনিময় করতে পারতেন। তাতে ল্যাটিন ভাষার অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ উপকৃত হতেন। এর একটা মন্দ দিকও ছিল তা এই যে, সমগ্র ইউরোপের কোন দেশের মাতৃভাষা ল্যাটিন ছিল না। কেবলমাত্র abstract বিষয় এই ভাষায় আলোচিত হতে পারত। চার্চের বর্হিভূত স্াধারণ মানুষ (layman) গণের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু বিষয় ল্যাটিন ভাষায় রচিত হত না। ল্যাটিনের প্রভাবে সাধারণভাবে সেকুলার বা ঐহিক বিষয়াদি অবহেলিত হত। সর্ব্বত্র চার্চের প্রভাব ছিল অক্ষুন্ন। এই আবহাওয়াটা ছিল প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই মধ্যযুগে দর্শন হয় পড়ল অতিমাত্রায় abstract। কতকগুলি abstract শব্দের সংজ্ঞা দিবার দিকে দার্শনিকদের ঝোঁক ছিল খুব বেশি। এবং তার ফলে দর্শনের বেশি উন্নতি হতে পারে নি।

নানা জাতির ও নানা মানুষের চিন্তার ফলে আধুনিক দর্শন উদ্ভুত হয়েছে। যাঁরা আধুনিক দর্শনের বিকাশে সাহায্যে করেছেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন চার্চ বহির্ভূত

সাধারণ মানুষ। তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষায় চিন্তা করেছেন। এবং এই ভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রকৃতি ও জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ টেকনিকাল পুস্তকাদি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় রচিত হয়েছেল। সেইজন্য ইউরোপের সবদেশের পণ্ডিতগণ সেই পুস্তক পাঠ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। পরে আরও পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হ'ল। তাঁরা দরকারী পুস্তকগুলি ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আধুনিক দর্শন কতকটা আন্তর্জাতিক বটে। কারণ প্রত্যেক দেশের দার্শনিকগণ দর্শন বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণা করেন অপর দেশের দার্শনিকগণ তা যত্ন সহকারে পাঠ করেন। দু'হাজার বছর ধরে ইউরোপের যে দর্শন বিকশিত হয়েছে, তার গোড়ায় আছে গ্রীক-দর্শন। আধুনিক দর্শন তারই পরিণত ও সংস্কারিত রূপান্তর মাত্র। ইউরোপের আধুনিক দর্শন আরম্ভ হয়েছে বেক্‌নের সময়। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় আধুনিক দর্শনের পিতা। তারপর ডেকার্ট, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ নূতন নূতন চিন্তার দ্বারা আধুনিক দর্শনকে পুষ্ট করেন। এই সব দার্শনিকগণের প্রত্যেকেই এক একজন দিকপাল। এক একজনকে কেন্দ্র করে বিরাট দর্শনশাস্ত্র পরিপুষ্ট হয়েছে। তাঁদের কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

বহরমপুর গার্লস কলেজ পত্রিকা, উনবিংশতি সংখ্যা, ১৩৭৭, পৃ: ৫৩-৬৭

পরিশিষ্ট - ১০

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

রেজাউল করীম

বাংলাদেশের একজন কবি বলেছেন, জগত জুড়িয়া এক জাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষজাতি। বাস্তবিকই পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতিকে নিয়ে এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন কত আনন্দদায়ক। পৃথিবীতে কি তা কোনদিন হবে? যদি তা নাও হয় তবু সে স্বপ্ন দেখার দোষ কি? অতবড় স্বপ্ন হয়তঃ বাস্তবে রূপায়িত হতে বিলম্ব হবে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত এক দেশের সমস্ত অধিবাসীকে নিয়ে একজাতি গঠন করার আদর্শ পূর্ণ হবার পথে তো কোন বাধা থাকা উচিত নয়। আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে কত ধর্ম সম্প্রদায় বসবাস করে। তাদের ধর্ম আলাদা, ভাষা আলাদা এবং আরও নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের লোক বুঝতে পারে না। এক প্রদেশের কালচার ও সংস্কৃতি অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি থেকে বহু বিষয়ে পৃথক। কিন্তু তবুও গোটা ভারতে এক জাতীয়তা গঠনের জন্য আমাদের পূর্বতন নেতারা কত সাধনা করে গেছেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত সেই এক জাতীয়তার কথাই ঘোষণা করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, উৎকল, দ্রাবিড়, বঙ্গ। কত যুগ থেকে কত মানুষের ধারা এই ভারতে এসে এক দেহে মিলিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান শিখ বৌদ্ধ জৈন—সকলকেই ভারতমাতা আপন কোলে স্থান দিয়েছেন। আমরা সকলেই এক, এবং একজাতির অন্তর্গত?

শতাধিক বছর পূর্বে গোটা ভারতে এক জাতীয়তা গঠনের জন্য আমাদের বীর শহীদগণ অসাধ্য সাধন করে গেছেন। আমাদের নেতারা সেই উদ্দেশ্যে আমরণ সংগ্রাম করেছেন। জাতীয়তার আদর্শের সহিত খাপ খায় না এমন কোন আদর্শকেই তাঁরা কোনদিন প্রশ্রয় দেন নি। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তার জন্ম লগ্ন থেকেই দেশের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে জাতীয়তা ও জাতীয় ঐক্য গঠনের জন্য চেষ্টা করেছেন। জাতীয় সংহতি সাধন কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। উহাই তার অন্যতম মূলনীতি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রশ্ন এই তা যদি হয়, জাতীয়তা গঠনই যদি জাতীয় নেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে এদেশে অহরহ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন কেন উঠে? কেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোথাও কোথাও অনৈক্যের ভাব দেখা যায়? আজ আমরা যে সাম্প্রদায়িকতার

কথা শুনি তা অধুনালুপ্ত বৃটিশ শাসনের ঐতিহ্য। তাদের বিভেদ সৃষ্টি কর ও শাসন কর এই কূটনৈতিক কর্ম্মধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। বৃটিশ শাসকগণ নিজেদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করেছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা যে বহুলাংশে সফল হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তারই শেষ পরিণতি হল দেশ বিভাগ। সে এক বিস্তৃত ইতিহাস।

স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল বৃটিশ শাসনমুক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িতার আর অস্তিত্ব থাকবে না। এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের স্বাধীন ভারত কোন ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়—ইহাই পরিপূর্ণ সেকুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অর্থাৎ এটা এমন এক রাষ্ট্র যেখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত হবে না। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে নিয়ে এই যে, বিশাল ভারতবর্ষ এর অধিবাসীর পরিচয় হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি নয়। এরা সকলেই ভারতের নাগরিক— ভারতীয় জাতির অঙ্গীভূত অবিচ্ছিন্ন অংশ। এখানে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সকলেই সমান অধিকারের অধিকারী। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কোথাও কোনরূপ বিভেদ স্বীকৃতি হয়নি। এই প্রকার সার্বজনীন সেকুলার অধিকার থাকা সত্বেও দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করলে তা শুধু জাতীয়তার আদর্শকে নষ্ট করবে না। তা জাতীয় জীবনের প্রাণ শক্তিকে নিস্তেজ করে দিবে। আজ সময় এসেছে, যখন সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে উৎখাত করে দিতে হবে। এবং জাতীয়তার আদর্শকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মজবুত করতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা আলোচনা করবার সময় একটা বিষয় জলের মত পরিষ্কারভাবে দেখা দেয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ও সাধারণভাবে এদেশের হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের পরস্পর সম্পর্ক সব সময় হৃদ্যতাপূর্ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন। দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে কতকটা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পথে ঘাটে দোকানে-বাজারে গ্রামে নগরে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও প্রীতিপূর্ণ। কথায় কথায় তারা ঝগড়া বিবাদ করে না, একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরীভাব দেখা যায় না। এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোককে কখনো শত্রু মনে করে না। কোন বিদেশী লোক যদি হঠাৎ কোন গ্রামে এসে এদের পরস্পরের সম্পর্কটা লক্ষ্য করে, এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী দেখে তবে সে ভাবতেই পারবে না যে এদেশে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যার অস্তিত্ব আছে। এই যদি বাস্তব সত্য হয় এই যদি স্বাভাবিক সম্পর্ক হয় তবে এই সম্পর্কটাকে সর্ব সময়ের জন্য স্থায়ী করাটা কি খুব কঠিন কাজ? না তা নয়। এই মধুর সম্পর্ককে স্থায়ী করে চিরকালের সম্পর্ক করে তুলতে হবে। এইজন্য সকলে যদি সম্মিলিতভাবে সাধনা

করে তবে তাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ হবে। তাহলে দেখা যাবে যে, দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার অস্তিত্ব থাকবে না।

যে সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে বাধা দেয়, তা একটা পাপ। জাতির সুস্থ দেহে একটা মারাত্মক ব্যাধি। এই পাপ ও ব্যাধিকে দূর করার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোককে সাগ্রহে এগিয়ে আসতে হবে। একথা সত্য যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য আছে। ধর্মকে যাঁরা উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন তাঁদের নিকট এ পার্থক্যটা অতি সামান্য ব্যাপার। আজ প্রয়োজন ধর্ম সম্বন্ধে উদার ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকে ব্যাপকতর করে তোলার। সাধারণ লোকের মনে উদার ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করতে হবে। বিরোধের বিষয় অপেক্ষা মিলনের সদ্ভাবের ও প্রীতির বন্ধনের উপর অধিকতর জোর দিতে হবে; এজন্য প্রয়োজন অপরের ধর্ম্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করা। তা করতে হলে এক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। কি কি ঐতিহাসিক কারণে ও কি অবস্থায় ও পরিবেশের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—এসব বিষয় জানা দরকার।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে নানা প্রভাবের ফলে কোন ধর্ম্মই তার আদিম বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ দাঁড়িয়ে নাই। প্রত্যেক ধর্মের উপর নানা প্রকার প্রভাব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি প্রভাব পতিত হয়েছে। এইসব প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত ধর্ম্ম কেন আজকের যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করবে না? কেন মান্ধাতার আমলের জিদকে নিয়ে আরও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মানব জাতি ক্রমে ক্রমে পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করছে—মিলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতের হিন্দু মুসলমান কি সেইভাবে অগ্রসর হবে না? তারা কি গোঁড়ামী বর্জন করে উদারভাবে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হবে না? মনে রাখতে হবে যে সকল ধর্ম্মই শিক্ষাও একই প্রকার। নৈতিক জীবন যাপন—পরোপকার করা, মানুষের কল্যাণ, সাধন, সদাচারণ, সততা, সত্য ভাষণ, চরিত্র গঠন, প্রেম প্রীতি-মাখা আচরণ ও সর্ব্বজীবে ভালবাসা সকল ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানের মর্ম্মকথা ত এইগুলি। এইসব সদগুণের একটির অভাব হলে আধ্যাত্মিক জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। খুন হত্যা জখম লুণ্ঠন আর বিদ্বেষ ও অগ্নিদাহ কখনই আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক হতে পারে না। এ দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এইসব আদর্শ অহরহ জাগ্রত করে তুলতে হবে। তা যদি করতে পারি তবে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকবে না। ঐক্যবোধও সুদৃঢ় হবে ও বাস্তব হয়ে উঠবে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য তথা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব। একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আজ ধর্ম্মকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

এদেশে সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ মতবাদের জন্য। দৈনন্দিন জীবনে ঝগড়া বিবাদের কারণ থাকে না। কিন্তু যখন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় তখন মাঝে মাঝে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। এমন কি দাঙ্গা হাঙ্গামাও হয়ে থাকে। সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাস ও ক্রিয়াকাণ্ড আছে। কাহারও কোন বিশ্বাসে ও ক্রিয়াকাণ্ডে কোনও রূপ বাধা সৃষ্টি করব না, বরং সহজভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকেই যাতে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা সকলের থাকা দরকার। কোন ধর্ম্মের নিন্দা করব না—বা এমন কাজ করব না যাতে কোন সম্প্রদায়ের মনে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে—এইসব হল যুগের দাবী, ঐক্যের দাবী, মানবতার দাবী। এইরূপ একটা সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করবার জন্য আজ সকলকে আহ্বান করি—আজ দেশের হিন্দু মুসলমান ভাইগণকে আহ্বান করি আসুন, আমরা সকলে ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ করি। নিস্ক্রিয়ভাবে নয় সক্রিয়ভাবে। তা যদি করতে পারি তবে দেশে কোন সাম্প্রদায়িক উপদ্রব থাকবে না।

জঙ্গম : সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্ত চিন্তা বিষয়ক ত্রৈমাসিক
৪র্থ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি - জুন, ১৯৮৮